স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীল পত্র (ASSIGNMENT) ডিসেম্বর, ২০১৫ ও জুন ২০১৬

ইতিহাস (History)

AMBITION

সহায়ক পাঠক্রম (Subsidiary)

[S-1, SHI-I (New) : Ancient and Medieval India

[From earliest time to 1707]

New Syllabus : (From July 2010 Enrolment Session)

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ-

ক) হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করুন ?

উঃ– সিন্ধু সভ্যতা অর্থাৎ হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতার আবিষ্কার যেমন বিস্ময়কর, তার থেকে আরও চিত্তাকর্ষক তার পতন। এই মহান সভ্যতার পতনের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টায় স্বাভাবিকভাবেই পন্ডিতরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে সহমতে পৌঁছেছেন যে দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দের শুরুতেই হরপ্পা সভ্যতার শহর বা নগরায়ন ব্যবস্থার পতন ঘটেছিল। তবে এই সভ্যতার পতনের প্রক্রিয়া অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। কারণ হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, কালিবংগান প্রভৃতি অঞ্চলের নগরপরিকল্পনা এবং কাঠামোর দ্রুত অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। এই অঞ্চল ক্রমশ বস্তির ধারণ করেছিল। বৃহদ স্নানাগার আর মহেঞ্জোদারোর শষ্যভান্ডার আর ব্যবহার করা যায়নি। বাস্তুকার এই নৃতত্ত্ববিদদের মতে এই নগর সভ্যতার আয়তন হ্রাস পেয়েছিল। প্রথমে এই নগরসভ্যতা আয়তনে ছিল প্রায় ৮৫ হেক্টর। কিন্তু তা মাত্র তিন হেক্টরে পরিণত হয়। শহরের কার্যকলাপ বন্ধ হবার সঙ্গে হরপ্পার লিপি, ওজন, মাপ প্রভৃতি উধাও হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ১৮০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ নাগাদ মেসোপটেমিয়ার তথ্যতে, "সেলুহা" কথাটির ব্যবহার দেখা যায়নি। এই "সেলুহা" শব্দটি ভারতের নামের সঙ্গে জড়িত ছিল। সুতরাং অনুমান করা হয় যে, হরপ্পার জনগণের বিনাশ ঘটেছিল নয়তো অন্যত্র চলে গিয়েছিল। এরকম অনুমান আশ্চর্য নয়। কারণ হরপ্পার পরবর্ত্তীকালে চিহ্ন বর্তমান পাকিস্তান, মধ্য এবং পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা, জম্মু কাশ্মীর, দিল্লী, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব দুহাজার অব্দ থেকেখ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের মধ্যে দেখা গেছে। অনুমান করা হয় যেই অঞ্চলের সভ্যতাগুলি সরাসরি হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

সিন্ধু সভ্যতা ও হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের কারণ ঃ–

একথা সত্য যে, কোনো সভ্যতা আকস্মিক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। এর পেছনে একাধিক কারণ অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। হরপ্পা সংস্কৃতির আবিষ্কৃত বিভিন্ন নিদর্শনাবলীর ভিত্তিতে পন্ডিতগণ এই সভ্যতার পতনের জন্য একাধিক কারণকে চিহ্নিত করেছেন —

১) আভ্যন্তরীণ অবক্ষয় ঃ–

মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা ও অন্যান্য নগরের জনস্ফিতি ঘটার ফলে বৃহৎ অট্টালিকার স্থলে বাসস্থানগুলি ছোট্ট হয়ে যায় এমনকি সেগুলি রাস্তার ওপর এসে পড়ে। এ থেকে বোঝা যায়। যে এসময়ে পৌরসংস্থার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়ে।

২) ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন ঃ–

একদিকে মরুভূমির প্রসার ও অপরদিকে ইট পোড়াবার জন্য গাছ-গাছড়ার যথেচ্ছ ব্যবহার সমগ্র অঞ্চল ক্রমেই বনশূন্য হয় পড়ে এবং ফলে কৃষি অর্থনীতির বিপর্যয় ঘটে। কৃষি পরিবেশের অবনতি ঘটতে থাকলে মানুষ অন্যত্র সরে যেতে শুরু করে।

2015 (Final)

৩) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ–

হরপ্পা সভ্যতার অবলুপ্তির মূলে কেউ কেউ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা ভূমিকম্প ও প্লাবনকে দায়ী করেছেন। সিন্ধু উপত্যকার কাছেই ভূমিকম্পের উৎসস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক রাইকস, সাহানী, প্রমুখ প্লাবন ও বন্যাকে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হিসাবে দায়ী করেছেন। খনন কার্যের ফলে একাধিকবার

বিধ্বংসী বন্যার প্রমান আবিষ্কৃত হয়েছে। বন্যার প্রকোপ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে গিয়ে সিন্ধু বাসীরা অন্য বিপদ সৃষ্টি করেছে। ঘনঘন বন্যার জন্যই সম্ভবত সিন্ধু সভ্যতার ঘরবাড়ী কাঁচা ইঁটের পরিবর্তে পোড়া ইট দিয়ে নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। ইট পোড়ানোর জন্য গাছপালা কেটে আগুন জ্বালা হয়েছে। গাছের অভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমান ক্রমশ হ্রাস পেয়ে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছে।

৪) রক্ষণশীলতা ঃ–

বহুপন্ডিত সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণ হিসাবে এখানকার অধিবাসীদের রক্ষনশীলতাকে দায়ী করেছেন। এই রক্ষণশীলতা শুরু হয়েছিল মানসিক ক্ষেত্রে এবং প্রসার লাভ করেছিল অর্থনৈতিক রক্ষনশীলতায়। সিন্ধুবাসীগণ সুমের বা ব্যবিলনের উন্নত অর্থব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু সেগুলি নিজেদের জীবনে গ্রহন ও প্রয়োগ করার আগ্রহ বোধ করেননি। যেমন জলসেচ দ্বারা কৃষিকাজ, কিংবা ভারী ও ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ইত্যাদি দ্বারা প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সিন্ধুবাসীরা নতুনকে গ্রহন না করেই চিরাচরিত ব্যবস্থাকেই আঁকড়ে ছিলেন। নতুন কিছু শিক্ষার বা কাজের উদ্যম তাদের ছিল না। এই কারণটির ফলে হরপ্পা সংস্কৃতি তার উচ্ছল প্রাণশক্তি হারিয়ে ক্ষয়িষ্ণু, জরাজীর্ণ হয়ে যায় এবং ধ্বংসের কোলে ঢলে পড়ে।

৫) সংঘাত ও রক্তপাত ঃ–

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হিসাবে অধিকাংশ পন্ডিত সংঘাত ও রক্তপাতকে নির্দিষ্ট করেছেন। তবে এই সংঘাত রক্তপাত কেন ঘটেছিল সে বিষয়ে দ্বিমত আছে। কারও মতে এই অন্তর্বিপ্লব বা গৃহযুদ্ধ থেকেই এই রক্তপাত ও অনিবার্য ধ্বংস ঘটেছে। আবার অনেকে এজন্য বহিঃশত্রুর আক্রমণকে দায়ী করেছেন। এই তত্ত্বের সমর্থকরা নির্দিষ্ট ভাবে বৈদিক আর্যদের আক্রমণকে ইঙ্গিত করেছেন। আবিষ্কৃত মৃতদেহের কঙ্কালে ভারী বস্তুর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এবং আর্যরা ভারী অস্ত্র ব্যবহার করত এটাও প্রমাণিত সত্য। তাছাড়া ঋকবেদে ইন্দ্রকে "পুরন্দর" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরন্দরের অর্থ পুর বা নগর ধ্বংসকারী। আবার সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা নগরে বসবাস করত। তাই আর্যদের সিন্ধু উপত্যকায় গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসকারী বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

উপসংহার ঃ–

বস্তুতঃ সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা খুব সহজ নয়। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে চরম বিকাশের পর সিন্ধু সভ্যতার অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। ক্রমে তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেইসময় হয়তো আকস্মিক আক্রমণ এই সভ্যতার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছিল।

খ) অশোকের ধম্ম নীতির মূল বৈশিষ্ট্য কী কী ছিল ?

উঃ– ভূমিকা ঃ–

বীরবাহুর চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র কিংবা বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলেই অশোক পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় বা বর্ণীয় নন। ধর্মনীতির অনুশীলন এবং ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টার জন্যই তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাততম রাজাগণের মধ্যেও তাঁর স্থান অপ্রীতদন্দ্বী, অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। কলিঙ্গ বিজয় মহারাজ অশোকের জীবনের এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিল যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। তাই ভিনসেন্ট স্মিথ যথার্থই মন্তব্য করেছেন– "The kalinga war was the decisive events in the this story of the world" কলিঙ্গ যুদ্ধে লক্ষ নিহত লক্ষ্য লোকের ও তাদের অগণিত আর্তনাদ, আত্মীয় পরিজনের শোক ও বেদনা তাকে বিচলিত করেছিল। তিনি অনুভব করলেন বাহুবলে রাজ্যবিজয়ে লোভে বা হিংসায় সুখ ও শান্তি নেই – ত্যাগ, সংযম ও অহিংসা মানুষকে সুখ ও শান্তি তৃপ্তি ও কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে। কেবল ইহালোকের চিন্তা নয়, পরলৌকিক কল্যাণের ব্যবস্থাও করতে হবে।

অশোকের ধর্মমতের স্বরূপ নির্ণয় ঃ–

অশোকের ধম্ম বা ধর্মনীতিকে বিচার করতে হলে আগে তিনি কি মত প্রচার করেছেন, তা জানা দরকার। ডঃ R.K মুখ্যার্জীর মতে, অশোক তার ধর্মে ব্যক্তি জীবন ও সমাজজীবন উভয়কেই পরিসুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় ও সপ্তম স্তম্ভলিপির অনুশাসনগুলি প্রধানত ব্যক্তি জীবনকে পরিসুদ্ধ করার জন্য রচনা করা হয়। এতে বলা হয় যে

(ক) ব্যক্তি দয়া দান, সত্য কথা বলবে, সূচিতা ও নম্রতা মেনে চলবে। এই নীতিগুলিকে প্রত্যহ ও সর্বদা পালনের জন্য প্রতি ব্যক্তি।

(২) প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকবে।

(৩) প্রাণির দৈহিক ক্ষতি করবে না।

(৪) পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে।

(৫) গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে।

AMBITION
2015 (Final)

(৬) দান বা ভৃত্যদের প্রতি সৎ ব্যবহার করবে।

(৭) অহিংসা অবশ্যই কায়মনবাক্যে পালন করবে।

(৮) অল্প সঞ্চয় ও অল্প ব্যয় করবে। যাতে লোকের পাপে না পড়ে যেজন্য তিনি ব্যক্তিকে উগ্রতা, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতি ত্যাগ করতে পরামর্শ দেন।

খ) সপ্তম স্তম্ভলিপিতে অশোক সমাজের উন্নতির জন্য কয়েকটি নীতি পালনের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এগুলি হল —

AMBITION

(১) অন্যধর্ম ও অন্য সম্প্রদায়কে নিন্দা বা ঘৃণা করা থেকে বিরত থাকা। নিজধর্মকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও পরধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করাকে তিনি পাপ বলে অভিহিত করেছেন।

(২) সকল সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে পরস্পরকে ভালোবাসতে পারে সেজন্য তিনি তাদের একত্রে বসবাস করতে ও পরস্পরকে শাস্ত্র পড়ে বহু সত্য হতে বলেছেন। এর ফলে তাদের মনের সংকীর্ণতা দূর হবে বলে মনে করতেন

(৩) ধর্মমহাপাত্রদের তিনি সকল সম্প্রদায় যথা ব্রাহ্মণ, নিগ্রন্থ,ইত্যাদি সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করার নির্দেশ দেন। সমাজরা গোষ্ঠী উৎসবে জীবহত্যা করতো তা তিনি নিষিদ্ধ করেছেন।

(৪) মহাপাত্রদের ধর্মমঙ্গল পালনে জনগণকে উৎসাহিত করলে স্বর্গলাভ হবে।

(৫) অশোক আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এইসকল আচার পালন করলে স্বর্গলাভ হবে।

অশোকের এই ধমনীতির সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করে ফ্লুই স্মিথ মুখ্যার্জী প্রমুখ পণ্ডিতরা এই ধম্মকে কয়েকটি মূলনীতির সমষ্টি বলেছেন। সকল ধর্মের সার কথা হতে ধনমডেভিম বলতে চেয়েছেন যে, এই ধম্ম কোন ধর্ম ছিল না। প্রকৃত জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের যা করা উচিত অশোক তার ধর্মে সেই কথাই বলেছেন, লক্ষ্যণীয় হয় যে, তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে – আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গীকমার্গ, কার্যকারণ সম্পর্ক, নির্বানচিন্তা, বুদ্ধের অতি প্রকৃত গুণাবলী ইত্যাদির উল্লেখ নেই। তাই উপরোক্ত পণ্ডিতরা ভারতবর্ষকে অশোকের প্রচারিত ধমনীতি বৌদ্ধ ধর্ম থেকে পৃথক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন।

ডঃ ভান্ডারকার এই মত সমর্থন করেননি, তিনি বৌদ্ধ সূত্র থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে অশোক যে ধম্ম প্রচার করেন তা আসলে লৌকিক বৌদ্ধ ধর্ম।

অশোকের ধর্ম ছিল তার সক্রিয় আবিষ্কার। এই ধর্ম হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হলেও মূলতঃ এটি ছিল একটি ব্যবহারিক সুবিধাজনক এবং নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সুস্থ জীবন যাপনে পদ্ধতি নির্দেশের প্রয়াসমাত্র। অশোকের ধমনীতি যদি শুধু বৌদ্ধনীতির লিপিবদ্ধকরণ হতো তাহলে তিনি সেকথা বলতেন। কেননা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও সমর্থন তিনি গোপন করেননি। বৌদ্ধ ধর্ম যে ব্যক্তি অশোকের ধর্ম ছিল তাতে কোন দ্বিমত নেই। শাসক হিসাবে তিনি রাজ্য মধ্যে যে ধমনীতি প্রচার করেন তাহলো মানব কল্যাণকর কতকগুলি নীতির সমষ্টিমাত্র। মানবের ইহালৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ সাধন ছিল তার প্রচারিত ধম্মের মূল লক্ষ্য। অহিংসাই ছিল তার ধর্মের মূলনীতি।

পরিশেষে বলা যায় যে বৌদ্ধধর্ম অশোকের প্রচারিত ধম্মকে কিছুটা প্রভাবিত করলেও এই প্রভাব ছিল ক্ষীন ও পরোক্ষ।

গ) হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

উত্তর ঃ- রাজা হর্ষবর্ধন পুষ্যভূতি বংশের অন্যতম নৃপতি ছিলেন। পুষ্যভূতি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রভারকরবর্ধন। বানভট্টের হর্ষচরিত থেকে জানা যায় যে তিনি পুষ্যভূতি বংশের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং পুষ্যভূতি ছিলেন একজন শৈব অর্থাৎ শিবের উপাসক। হর্ষবর্ধনের যোগে পুষ্যভূতি বংশের চারজন রাজার নাম জানা যায়। তাঁরা ছিলেন যথাক্রমে নরবর্ধন খুব সম্ভবত পঞ্চম বা ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হন। আদিত্যবর্ধন পরবর্তী গুপ্তরাজাদের কোনো রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তৃতীয়জন অর্থাৎ প্রভাকর বর্ধন বানভট্টের বর্ণনা অনুযায়ী হুনদের পরাস্ত করেন। প্রভাকর বর্ধন মহারাজধীরাজ এবং পরম ভট্টায়ক উপাধি গ্রহন করেছিলেন।

হর্ষবর্ধনের আগমন ঘটেছিল এক সংকটময় মুহূর্তে। হর্ষচরিত থেকে জানা যায় যে প্রভাকরবর্ধন এমন কোনো সময় মারা যান যখন তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন হুনদের সঙ্গে যুদ্ধে বা তাদের আক্রমণের মোকাবিলায় ব্যস্ত ছিলেন। রাজ্যবর্ধন এই দুঃসংবাদ সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পান তাঁর কনৌজের ভগ্নিপতি গ্রহবর্মনকে মালবের রাজা দেবদন্ড গুপ্ত এবং তার মিত্র বাংলার রাজা শশাঙ্ক পরাস্ত এবং হত্যা করেছে। তার ফলে তাঁর ভগ্নী রাজ্যশ্রী দেবগুপ্তের হাতে বন্দী হয়েছে। রাজ্যবর্ধন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কনৌজের দিকে অগ্রসর হন। প্রারম্ভিক সাফল্য অর্জন করলেও শশাঙ্কের ষড়যন্ত্রে রাজ্যবর্ধন নিহত হন। তবে বানভট্টের এই তথ্য সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকার করেছেন। সত্য বা মিথ্যা হোক না কেন গ্রহবর্মন ও রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু ঘটেছিল এবং অতি দ্রুত ঘটেছিল।

2015 (Final)

এরূপ জটিল এবং সংকটময় মুহূর্তে হর্ষবর্ধনকে থানেশ্বর এবং কনৌজ উভয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল।

সময়টা ছিল ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ। হর্ষবর্ধন দায়িত্ব গ্রহন করেছিলেন তবে কিছুদিন তিনি "কুমার" উপাধি রাখেন এবং তাঁর "রাজা" ইত্যাদি অভিধা ছিল না। হর্ষবর্ধনের ইতঃস্তত বা অনিচ্ছা মনোভাবের কথা বলা হয়েছে। এই অনিচ্ছার অন্যতম কারণ যে গ্রহবর্মন যদিও নিঃসন্তান ছিলেন কিন্তু তাঁর ভাই জীবিত ছিলেন। এমনকি নালন্দা শীল থেকে জানা যায় যে তিনি কনৌজের সিংহাসনে আরোহনও করেছিলেন। তবে খুব অল্পকালের মধ্যেই হর্ষবর্ধন কনৌজকে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্ররূপে গড়ে তুলেছিলেন।

বাণভট্টের "হর্ষচরিত" থেকে জানা যায় যে হর্ষবর্ধন ভান্ডীকে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করেন। তাঁকে শশাংকের সঙ্গে মোকাবিলা করার দায়িত্ব দিয়ে হর্ষবর্ধন ভগ্নীর সন্ধানে বিন্ধ্যপর্বতের দিকে অগ্রসর হন। তিনি প্রাগজ্যোতিষ বা আসামের অধিপতি কুমার ভাস্কর বর্মনের মৈত্রী স্থাপন করেন। রাজ্যশ্রীকে বিন্ধ্যপর্বতের অঞ্চল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু শশাঙ্কের সঙ্গে তাঁর যে সংঘর্ষ হয়েছিল, তাতে তিনি পরাজিত বা সাফল্য অর্জন করেছিলেন কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে একথা ঠিক যে শশাঙ্ক ৬৩৭-৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মারা যান এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত শশাঙ্ক যে নির্বিঘ্নেই রাজত্ব করেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নিদামপুর তাম্র লেখ থেকে জানা যায় কুমার ভাস্করবর্মন হর্ষের মিত্র রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিউ-য়েন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে হর্ষবর্ধন রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনি তাঁর কন্যার সঙ্গে বল্লভী রাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের বিবাহ দিয়েছিলেন।

হর্ষবর্ধনের রাজ্যজয় সম্পর্কে হিউ-য়েন-সাঙ এর বিষদ বিবরণ, তারিখ, পরিধি ইত্যাদি জোরালো বা তথ্য ভিত্তিক নয়। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি "পঞ্চভারত" জয় করেছিলেন এবং অবিরাম যুদ্ধে নিজেকে লিপ্ত রেখেছিলেন। হর্ষবর্ধন উত্তরবঙ্গ এবং কামগোড়া অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। বৈবাহিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বল্লভীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এবং অবশেষে তিনি জয়লাভ করেন। বানভট্ট দাবী করেছিলেন হর্ষবর্ধন সিন্ধু প্রদেশ তুষারশৈল। এবং অবশেষে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে উপযুক্ত প্রমাণের অভাব আছে।

হর্ষবর্ধনের সাময়িক সাফল্য কিন্তু বিনা প্রতিরোধে হয়নি। ৬১৪-৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আইহোল লিপি থেকে জানা যায় চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনকে পরাস্ত করেন। হর্ষবর্ধনকে এই শিলালিপিতে সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ যুদ্ধের স্থান বা সময় সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। অনেকে মনে করেন যে এই যুদ্ধ নর্মদা নদীর উপত্যকায় ঘটেছিল কিন্তু সে সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব আছে।

ঐতিহাসিকগন মনে করেন যে হর্ষের সামরিক সাফল্য এবং রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে বানভট্ট যে বিবরণ দিয়েছেন তা অনেকাংশ অতিরঞ্জিত। চালুক্য তথ্যে হর্ষবর্ধনকে উত্তরাপথের অধিপতিরূপে যে বর্ণনা সকরা হয়েছে তার অন্যতম কারণ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর গৌরব ও কৃতিত্বকে বড় করে দেখানো অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সাম্প্রতিককালে যেসব তথ্য জানা গেছে তা থেকে বলা যায় যে হর্ষবর্ধন সমগ্র "উত্তরাপথের" অধিপতি ছিলেন। তবে বাংলায় কিছু অংশ বিহার, উড়িষ্যা, কামরূপ এবং বল্লভীর রাজারা সম্ভবত তাঁর মিত্র রাজ্য ছিল। এগুলির উপর তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সিন্ধু প্রদেশ নেপাল ও কাশ্মীর অঞ্চলেও অনুরূপ ছিল। নর্মদার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত তার আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল এ ব্যাপারেও তথ্য যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ নয়। তবে একথা সত্য যে কনৌজ তাঁর সময়ে সর্বকালীন প্রভাবশালী রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে কনৌজ পাটলিপুত্রের ম্লান করে দিয়েছিল। কনৌজ অন্যতম রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তা বজায় ছিল।

হর্ষবর্ধনের কৃতিত্বের অন্যতম সীমাবদ্ধতা ছিল যে তিনি অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুকাল ছিল ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর মৃত্যুর পর চারিদিকে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন প্রাদেশিক রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল। হর্ষের সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

হর্ষবর্ধন শুধুমাত্র বিজেতা ও শাসক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন না। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত থাকলেও তিনি সাহিত্য বিষয়ে যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। তাঁর অন্যতম সভাসদ বাণভট্ট "হর্ষচরিত" এবং "কাদম্বরী" রচনা করেছিলেন। তিনি নিজে নাগানন্দ প্রিয়দর্শিকা এবং রত্নাবলী গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর দানশীলতা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে ছিলেন শৈব অর্থাৎ "পরম মহেশ্বর" রূপে পরিচিত ছিলেন। তথাপি তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এবং রাজ্যে জীবহত্যা নিবারণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে প্রয়াগ মেলা এবং কনৌজ ধর্মসভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গৌতম বুদ্ধের নামের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন স্থানে মঠ, স্তুপ, চৈত্য নির্মাণ করেন। প্রয়াগের মেলায় তাঁর দান ভারতের উচ্চ রাজআদর্শের অন্যতম উদাহরণ। তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল এবং বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর ছিল। দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও তস্করদের উপদ্রব্য ছিল। হিউয়েন সাঙ নিজেই তস্করদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল।

AMBITION
2015 (Final)

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

ক) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় সাহিত্যিক উপাদানগুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ঃ- প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির মধ্যে প্রথমেই লেখগুলির স্থান। একদিক থেকে বিচার করলে লেখগুলির গুরুত্ব সাহিত্যের চেয়ে বেশী। কেন না, যুগে যুগে সাহিত্যের ভিতর পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু লেখগুলি অপরিবর্তিত থেকে গেছে। তাছাড়া, সাহিত্যগ্রন্থগুলির তুলনায় লেখগুলির রচনাকাল অনেকটাই নিশ্চিত। লেখ বিভিন্ন তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা লেখ থেকে বিভিন্ন ঘটনার সন তারিখ জানা যায়। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে লেখর গুরুত্ব এত বেশী যে বলা যায়, লেখর অনুমোদন ছাড়া কোন তথ্য এবং তারিখই সত্যের মর্যাদা পায় না। প্রকৃতপক্ষে অন্য উপাদান থেকে প্রাপ্ত তথ্যদিয়ে লেখ নিয়ন্ত্রিত করে।

AMBITION

লেখর জন্য বিভিন্ন দ্রব্য, যেমন - সোনা, রূপা, লোহা, তামা ব্রোঞ্জ, পাথর ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে, লেখগুলিতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, পালি, প্রাকৃতি, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম প্রভৃতি ব্যবহৃত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মী কখণও বা স্থানীয় অধিবাসীদের সুবিধার জন্য খরোষ্ঠী বর্ণমালা ব্যবহৃত।

যেমন সাহিত্যিক, তেমনই লেখসমূহকে দেশী ও বিদেশী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ভারতীয় লেখগুলির মধ্যে অশোকের লেখসমূহ প্রথম এবং প্রধান। এগুলি একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠীত। ১৯৩৭ সালে কলকাতা টাকশালের কর্মী এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এর সম্পাদক প্রিনসেপ অশোক লেখর পাঠোদ্ধার করেন। এই লেখগুলি শিলাখণ্ডে, স্তম্ভগাত্রে এবং গিরিগুহায় পাওয়া গেছে। শিলাখণ্ডে প্রাপ্ত লেখ শিলালেখ, স্তম্ভগাত্রে প্রাপ্ত লেখ স্তম্ভলেখ এবং গিরিগুহায় প্রাপ্ত লেখকে সংক্ষেপে গুহালেখ বলা হয়। অশোকের গুহালেখ গয়া জেলার অন্তর্গত বারাবার পাহাড়ে পাওয়া গেছে। তাঁর শিলালেখ এবং স্তম্ভগুলিকে প্রধান এবং অপ্রধান এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রধান লেখগুলি পরপর সারিবদ্ধ ভাবে সজ্জিত এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ বস্তু পরিমাণে বৃহৎ। অপ্রধান লেখগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং সংক্ষিপ্ত। সাধারণভাবে বলা যায় যে, অশোকের প্রধান শিললেখগুলি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে পাওয়া গেছে। অশোক সর্বত্র সাধারণভাবে ব্রাহ্মালিপি ব্যবহার করেছেন। শুধুমাত্র ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, স্থানীয় জনসাধারণের সুবিধার জন্য খরোষ্ঠী ব্যবহৃত হয়েছে।

অশোক পরবর্তী লেখ সমূহকে সরকারী ও বেসরকারী এই দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। সরকারী লেখগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত। এক প্রশস্তি এবং দুই ভূমিদান বিষয়ক। প্রশস্তি সমূহের মধ্যে হরিষেণ রচিত সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। তেত্রিশ লাইনের এই দলিলটি গুপ্তদের জন্য সাধারণভাবে, সমুদ্রগুপ্তের জন্য বিশেষভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ। এতে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক চিত্র এবং সমুদ্র গুপ্তের কৃতিত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। কৌশাম্বি এই লেখর সাথে অশোক লেখর তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অশোকের লেখ সহজ, নম্র এবং প্রাকৃত ভাষায় রচিত, আর হরিষেণ প্রশস্তি অতি অলঙ্কৃত সংস্কৃতে। তাই তারতম্যের মধ্যে উভয় সাম্রাজ্যের চরিত্রগত পার্থক্য ধরা পড়ে। সাতবাহন বংশের নৃপতি গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্নীর নাসকি প্রশস্তি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। গোতমীপুত্রের মৃত্যুর উনিশ বছর পর, তাঁর মা গৌতমী বলশ্রী কর্তৃক এই প্রশস্তিটি রচিত। এতে গৌতমীপুত্রের রাজ্যজয়ের এবং সমাজ সংস্কারের বিশেষ উল্লেখ আছে। শকদের মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় শোললেখ ও একটি প্রশস্তি। এতে তাঁর রাজ্যজয়ের এবং জনকল্যাণমূলক কাজের বিবরণ আছে। এগুলি ছাড়া গোয়ালিয়র প্রশস্তি থেকে প্রতিহার বংশীয় রাজা ভোজের, আইহোল (মহীশূরের অন্তর্গত) প্রশস্তি থেকে দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশের দ্বিতীয় পুলকেশ্বরী এবং উমাপতি ধর রচিত দেওপাড়া (রাজসাহী জেলার অন্তর্গত) প্রশস্তি থেকে বঙ্গদেশে সেন বংশের রাজা বিজয় সেনের কীর্তিকাহিনী জানা যায়। ভুবনেশ্বরের নিকট প্রাপ্ত, কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতিগুম্ফ লেখ প্রশস্তি নয়। তবে এতে খাবেলের কার্যাবলীর বংশানুক্রমিক বিবরণ আছে।

ভূমিদান সম্পর্কিত দলিলগুলি দু'দিক থেকে মূল্যবান। প্রথমত-এগুলির মধ্যে প্রায়ই প্রশস্তি এবং বংশ তালিকা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়-এই দলিলগুলিতে অনেক সময় রাজকীয় অধিকার হস্তান্তরের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা প্রাচীন ভারতের শাসনতন্ত্রের অস্তিত্বের কথা মনে আনে।

2015 (Final)

সরকারি লেখর তুলনায় বেসরকারী লেখর সংখ্যা অনেক বেশি এবং এগুলির মধ্যে অনেক কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে গুপ্তযুগের পূর্ববর্তী, লেখগুলির বেশির ভাগ প্রাকৃত ভাষায় লেখা এবং সেগুলি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সংক্রান্ত। গুপ্তপরবর্তী যুগের লেখগুলি প্রায়ই সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং ব্রাহ্মণ ধর্মবিষয়ক। এই পার্থক্য থেকে বলা চলে যে গুপ্ত ভাষা ও ধর্মের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল।

বৈদেশিক লেখগুলির মধ্যে এশিয়া মাইনরে আনা গেলিয়ার (হিট্টাইটদের রাজধানী) প্রাপ্ত লেখ (আণুমানিক খ্রীঃপূঃ ১৪০০ অব্দ) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই লেখতে আর্য নামের রাজাদের এবং তাদের সন্ধির উল্লেখ আছে। এই সন্ধির

রক্ষক হিসাবে বিভিন্ন আর্য দেবতা, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে ঋক বেদের সম্ভাব্য তারিখ অনুমান করা যায়। পারস্য সম্রাট প্রথম দারয়-বৌষ (ডারায়াস) (খ্রীঃপূঃ) -এর পারসেপলিস এবং নকস-ই রস্তম লেখ দুটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই লেখ দুটি থেকে উত্তর পাঞ্জাব এবং বেহিস্তান লেখ থেকে গান্ধার পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে জানা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতের উপনিবেশ বিস্তারের কাহিনী জানতে হলে প্রধানত বৈদেশিক লেখর উপর নির্ভর করতে হয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই লেখগুলি, কম্বোডিয়া, আন্নাম এর পূর্ব উপকূল, চমপা, যবদ্বীপ এবং বোর্ণিও তে পাওয়া গেছে। শুধুমাত্র ভারতের ক্ষেত্রে নয় ইন্দোচীন এবং ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসেও এগুলি বিশেষ মূল্যবান।

AMBITION

গ) খ্রিষ্টপূর্বষষ্ঠ শতকে মগধের উত্থান কি অনিবার্য ছিল ?

উঃ– খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ট শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় মগধে একটি রাজবংশ শাসন করত। পুরানে এই বংশের প্রথম রাজ শিশুনাগের নাম অনুসারে এই বংশের নাম শিশুনাগ বংশ। এই বংশের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। পুরান অনুসারে তিনি এবং অজাতশত্রুর পরবর্ত্তী ছিলেন, কেননা তারাই প্রথম এই অঞ্চলের মগধে শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুতরাং বলা যায় মগধের ইতিহাসে শিশুনাগের স্থান অবশ্যই তাদের পরে।

বিম্বিসার এর রাজত্ব থেকে মগধের অগ্রগতির ইতিহাস আরম্ভ হয়েছিল। সূর্যকে ঘিরে সৌরজগৎ এর মত, মগধকে কেন্দ্র করেই উত্তর ভারতের ইতিহাসক আবর্তিত হয়েছিল। যে মগধের এই উত্থান ইতিহাসে একটি আকস্মিক ঘটনা ছিল না। ব্যক্তিত্ব বড়, না বাস্তব বড় এই বিষয়টিতে না গিয়ে বলা যায় যে, মগধে এই কয় শতাব্দী ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটেনি। বিম্বিসার থেকে শুরু করে অশোক পর্যন্ত সবাই সমান অধিকার যোগ্যতায় ছিলেন না। বিম্বিসার, অশোক, এবং পরবর্ত্তী কালে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কয়েকটি নাম খুবই স্মরণীয় এই প্রসঙ্গে মগধের ইতিহাসে দুইজন মন্ত্রীর ও অবদান বিশেষ স্মরণীয়।

ব্যক্তিত্ব ছাড়াও মগধের নিজস্ব যোগ্যতাও খুব কম ছিল না। মগধ ছিল একটি যনধন্যস্ত রাজ্য। মগধ আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে পেয়েছিল নদী পাহাড়ের এই বেড়ায়। মগধের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছিল। মগধের জমি উর্বর ছিল বলে এখনকার দিনে জমিতে বছরে দুইবার ফসল ফলানো যেত। পরবর্ত্তীকালে রাজধানী পাটলিপুত্র নগরীও প্রস্তুতি সুরক্ষিত ছিল। এখানে আত্মরক্ষার সহায়ক ছিল। মগধ তার হস্তবাহিনীকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারাত্মক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে পারত। কৌটিল্য লিখেছেন যে – "রাজকোষ খনির উপর নির্ভর করে এবং সেনাবাহিনী রাজকোষের উপর। খনি হচ্ছে বজ্রদ্রব্যের গর্ভাশয়।" হিউয়েন সাঙের বিবরন থেকে জানা যায় যে, এই দুটি অঞ্চল কোন সময় সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। নাসিক প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে তাদের ধ্বংসকারী। পল্লবগণ ছিল পার্থিব এবং যবনসন, গ্রীক তাদের সঙ্গে সাতকর্ণীর সংঘর্ষের ইতিবৃত্ত জানা যায় না। কলিঙ্গ ও অন্ধ্রাদেশ যে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার প্রমান পাওয়া যায়।

নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্রকে "শক-যমন-পল্লব-নিসুদন" অর্থাৎ তাদের ধ্বংসকারী বলা হয়েছে। যেখানে নহপানের অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে দেখা গেছে যে তারা দুই তৃতীয়াংশ গৌতমীপুত্র পুর্ণমুদ্রিত হয়েছিল। এটা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে নহপান তার সমসাময়িক ছিলেন এবং তার দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন, নাসিক লেখতে যে স্থান গুলির উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে অপরান্ত, অনুপ, সুরাষ্ট্র, আকর, অবন্তী এই জয়ের ফলে গৌতমীপুত্র লাভ করেছিল গৌতমীপুত্র গোবর্ধন জেলায় বেনাধটক নগর নির্মাণ করেন এবং শকদের অনুকরণে মহারাজ গ্রহণ করে।

গৌতমীপুত্রের এই জয়লাভ স্থায়ী হয়নি, তিনি নহপানকে পরাজিত করে কিন্তু অপর একটি শাখা, কাহমক শাখা পরাজিত করে।

জুনাগড় লেখাতে আছে যে রুদ্রদামন দাক্ষিণাত্যের অধিপতি সাতকর্ণীতে দুইবার পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু কুটুম্ব বলে তাঁর রাজ্য গ্রাস করেননি। এই সাতকর্ণীকে ছিলেন এই বিষয়ে মতভেদ আছে। ডঃ ভান্ডার মনে করেন যে তিনি নিশ্চয় গৌতমীপুত্রকে বশিষ্টপুত্র পুলুময়ি রুদ্রদামনের জামাতা ছিলেন। ব্যক্তিগণ মনে করেন যে পরাজিত ছিলেন পুলুমায়ী।

নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী শুধু যোদ্ধারূপে চিত্রিত হননি। সংস্কারক রূপেও চিত্রিত হয়েছে। ডঃ গোপালচারি বলেছেন যে, যোদ্ধা হিসাবে বড় ছিলেন তিনি শান্তির দিক থেকে আরও বড় ছিলেন, নাসিক প্রশস্তিতে আছে তিনি ক্ষত্রিয়দের দর্প ও মান চুর্ণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ এবং নিম্নতম শ্রেণীর স্বার্থের উন্নতি বিধান করেছিলেন এবং বিভিন্ন জাতীর মধ্যে রক্তের মিশ্রণ বন্ধন করেছিলেন।

2015 (Final)

ডঃ গোপালচারি শেষ বক্তব্যটি মেনে নেননি। তিনি বলেছেন যে তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষিত হলেও কর্মভিত্তিক উপজাতি গঠন বন্ধ করা যায়নি। গৌতমীপুত্র ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্টপোষক হওয়ার সত্ত্বেও, বৌদ্ধদের ধর্ম প্রতি অতি উদ্ধার মনে করেছিলেন। তার সব বৌদ্ধদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কালে নাসিক প্রভৃতি স্থানের বিহারবাসীদের অতিভূমি। মগধে খনিজ দ্রব্য সঙ্গে বাণিজ্য যুক্ত হয়েছিল। নৌ বানিজ্যের জন্য মগধের অবস্থান বিশেষ অনুকুল ছিল। মগধ ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যভাগে। ধর্মশাস্ত্ররা মগধের মানুষকে মিত্র বলে অভিহিত করেছেন।

মগধের সম্প্রসারণের পিছনে আদর্শের প্রেরণাকে বোধ হয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না, একটি স্থানীয় স্বাধীনতার চিন্তা, যা বিভিন্ন জলপদ এবং স্বয়ং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে এই আকাঙ্খা বৌদ্ধ ধর্মের স্তম্ভকে রাজনীতির ক্ষেত্রে মগধ সাম্রাজ্যকে উত্থানকে সম্ভব করেছিল।

সর্বশেষে বলা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ট শতাব্দীর খন্ড, ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত ভারত মগধের এই উত্থানকে সম্ভব করেছিল, তখন ভারতের অবস্থা ছিল অষ্টাদশ শতকের অবস্থার মত ভারতে সর্বব্যাপী এই অনৈক্যের পিছনে প্রধান নত দুটি কারণ ছিল। একটি গভীর অরণ্য সঙ্কুল বিন্ধ্য পর্বতমালা, অন্যটি ভারতে বিভিন্ন জাতি উপজাতির অস্তিত্ব। এর ফলে ভারতে সমাজে সংহতি একেবারে ছিল না। এই অবস্থায় মগধের শাসকেরা পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল তারা সফল হয়েছিল সত্য, কিন্তু তাদের কাজ খুব সহজ ছিল না। কেননা মগধের সাম্রাজ্যবাদকে বারবার প্রজাতন্ত্রবাদের সঙ্গে সংগ্রাম অবতীর্ণ হতে হয়েছিল।

AMBITION

ঙ) সাতবাহন শাসনব্যবস্থার একটি বিবরণ দিন ।

উত্তর ঃ-**সাতবাহন শাসনব্যবস্থার বিবরণ ঃ**

~~মৌর্য সম্রাট অশোকের~~ মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে মৌর্য আধিপত্য দূর্বল হয়ে পড়ে এবং খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তুপের উপর সাতবাহন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। তিনশো বছরের সাতবাহন শাসনকালে শাসন ব্যবস্থা কে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা করতে পারি -

i) রাজার ক্ষমতা -

a) সাতবাহন শাসন ব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক এবং রাজার ক্ষমতা ছিল বংশানুক্রমিক।

b) সাতবাহন রাজাদের নামের সঙ্গে মায়ের নাম জড়িত থাকলেও পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনে বসতেন - এটাই ছিল স্বাভাবিক রীতি তাই অকারণে সাতবাহন রাজপরিবারে ভ্রাতৃ বিরোধের কোন নজির পাওয়া যায়নি।

c) রাজারা কোন আড়ম্বর পূর্ণ উপাধি ধারণ করতেন না। তাঁরা রাজন উপাধি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন।

d) ধর্মশাস্ত্রে রাজাকে ধর্মের রক্ষক বলে বর্ণনা করা হয়েছে - এমনকী দেবতাদের ক্ষেত্রেও কোনও কোনও গুণও তাঁদের উপর আরোপ করা হয়েছে। রাজারা নিজেদের ওপর রাম, ভীষ্ম, কেশব, অর্জুন প্রভৃতি দেবতার গুণাবলী আরোপ করলেও কখনোই নিজেদের ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবি করেন নি।

e) রাজা ছিলেন সর্বশক্তির আধার। তিনি ছিলেন প্রধান শাসক, প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারক ও আইন প্রণেতা।

f) এ সত্বেও তিনি স্বৈরাচারী ছিলেন না। তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা শাস্ত্রীয় নির্দেশ ও প্রচলিত রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

g) রাজার কর্তব্য ছিল দেশরক্ষা, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ, যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা পরিচালনা, ধর্মরক্ষা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও জনহিতকর কর্মসূচী গ্রহণ।

ii) সামন্ত শাসিত প্রদেশ - সাতবাহন রাজ্যে দুধরণের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল -

a) সামন্ত শাসিত অঞ্চল

b) রাজার প্রভাব শাসনাধীন অঞ্চল

সামন্তশাসিত অঞ্চলের শাসনভার থাকত সামন্তদের হাতে। রাজার অধীনে থেকে তারা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। উচ্চস্তরের সামন্তরা 'রাজা' উপাধি ধারণ করতেন। এমনকী অনেক সময় নিজেদের নামে মুদ্রাও প্রচলন করতেন। সামন্ত প্রভুদের মধ্যে 'রাজন', 'মহাসেনাপতি', 'মহারথী', 'মহাভোজ' প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর ছিল। এই সব সামন্তরা রাজ্য পরিবারের সঙ্গে বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হতে পারতেন।

2015 (Final)

iii) প্রশাসনিক বিভাগ - সাতবাহনরা মৌর্য প্রশাসনিক বিভাগকে অপরিবর্তিত রেখেছিল। রাজার প্রত্যন্ত শাসনাধীন অঞ্চল কয়েকটি জনপদে বিভক্ত ছিল। জনপদগুলি আবার মৌর্যদের অনুকরণে আহর বা জেলায় বিভক্ত ছিল। গ্রাম ছিল শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে তৈরী হত আহর।

iv) শাসকগণ - জনপদের শাসনকর্তা ছিলেন যুবরাজ। আহর - এর শাসনভার ছিল আমাত্য নামক কর্মচারীদের উপর। গ্রামের শাসনভার ছিল 'গ্রামিক' বা 'গেরিমালিকা' নামক কর্মচারীর উপর। তাঁর অধীনে ১২টি রথ, ৯টি হাতি, ২৫টি ঘোড়া এবং ৪৫ জন পদাতিক সেনা নিয়ে গঠিত একটি বাহিনী থাকত। গ্রামাঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া

হয়।

v) অন্যান্য কর্মচারীগণ - উপরিউক্ত কর্মচারী ছাড়াও সাতবাহনদের বিভিন্ন লিপি থেকে আরও কিছু কর্মচারীর নাম জানা যায়। সেগুলি হল -

a) রাজমাত্য - ছিলেন রাজার বিশেষ আস্থাভাজন এবং উপদেষ্টাদের একজন।

b) মহামাত্র - ছিলেন বিশেষ বিশেষ কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

c) ভান্ডারিক - হলেন ভান্ডারের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

d) লেখক - রাজকীয় দলিল দস্তাবেজ রচনার দায়িত্বে ছিলেন।

e) দূতক - হলেন রাজার দূত।

f) তলবর - হলেন প্রহরী এবং

g) মহাতলবর - পুলিশ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

vi) সামন্ত প্রথা - সাতবাহন রাজ্যে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ শাসন এবং রাজকর্মচারীদের করমুক্ত গ্রাম বা জমি দেওয়া হত। এই সব স্থান রাজকীয় প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ শ্রমণ বা রাজকর্মচারীরা এইসব স্থানের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন শক্তিশালী সামন্তরা 'রাজা' উপাধি নিতেন - এমনকী নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন করতেন।

vii) রাজস্ব - ভূমি রাজস্ব ছিল সরকারী আয়ের প্রধান উৎস। এছাড়া সীতা জমি, লবণ শুল্ক, জরিমানা প্রভৃতি থেকেও সরকারের আয় হত। নগদ অর্থ বা শস্যের মাধ্যমে রাজস্ব দেওয়া হত। সৈন্য ও সরকারী কর্মচারীরা বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগ করতেন। কৃষকদের অবস্থা ভালো ছিল না। সামন্ত প্রথার দরুণ তারা নানাভাবে শোষিত হত। সরকারী কর্মচারীরা মাঝেমধ্যেই কৃষকদের জমিতে হস্তক্ষেপ করত।

আলোচনার শেষে বলা যায় যে, এই বংশের শাসনকালেই সর্বপ্রথম সমগ্র দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সামন্ত প্রথার দরুন কৃষক সমাজ শোষিত হয়েছে, আবার বাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী হওয়া সত্বেও সাতবাহন শাসকরা ধর্মের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। সাহিত্য ও শিল্প কলার ইতিহাসের এর স্মরণীয়। তাই বলা যায় - সাতবাহনদের তিনশো বছরের শাসনকাল ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

৩। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন বা সংক্ষেপে উত্তর দিন। (যে কোনও চারটি)

চ) গুপ্ত সাম্রাজ্যে কর ব্যবস্থা।

উত্তর ঃ- বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদান থেকে আমরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের কর ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি।

ক) গুপ্তযুগের বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসন থেকে এই যুগের ব্রাহ্মণ, দেবমন্দির ও বৌদ্ধবিহার গুলিকে ভূমিদানের কথা জানা যায়। দান গ্রহীতারা নিস্কর ভূমি পেতেন। এই ব্যবস্থা 'অগ্রহার' নামে পরিচিত। দানগ্রহীতারা তাদের প্রাপ্ত ভূমিতে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতেন এবং ওই এলাকায় বসবাসকারী দের থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। গুপ্ত যুগে সংগ্রহের ব্যাপারে কৃষক ও রাজার মাঝে এক ধরণের মধ্যবর্তী শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল।

খ) এই যুগে ভূমিরাজস্বই ছিল সরকারী আয়ের প্রধান উৎস। তবে ভূমি রাজস্বের হার কি ছিল সে সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। ডঃ রণবীর চক্রবর্তী বলেন যে, সাধারণ ভাবে প্রধান ভারতীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে রাজা উৎপাদিত শস্যের এক ষষ্ঠাংশ পাওয়ার অধিকারী এবং একারণে তিনি 'ষড়ভাগিন' নামে অভিহিত। সম্ভবত গুপ্ত যুগেও ভূমি রাজস্বের হার ছিল এক ষষ্ঠাংশ।

i) এই এক ষষ্ঠাংশ 'ভাগ' নামে পরিচিত ছিল।

ii) গুপ্ত লেখমালায় 'কর' ও 'উপরিকর' নামে দুটি রাজস্ববোধক শব্দের উল্লেখ আছে যার অর্থ নির্ধারণ করা দুরূহ। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার - এর মতে 'কর' হল মুখ্য এবং 'উপরিকর' হল গৌণ রাজস্ব।

iii) স্থায়ী প্রজাদের ওপর বসানো কর ছিল 'উদ্রঙ্গ'।

iv) কৃষি উৎপাদনের ওপর পশ্চিম ভারতে 'ধান্য' এবং উত্তর ভারতে হালিলকর' নামে কর ধার্য করা হত।

v) ভূমিরাজস্ব সাধারণত ফসলের মাধ্যমে নেওয়া হত। তবে এ ব্যাপারে নগদ অর্থে যে কর নেওয়া হত তার নাম 'হিরণ্য'।

গ) ভূমিরাজস্ব ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকেও কর আদায় করা হত -

i) জঙ্গল, খনি, ফেরিঘাট ছিল সরকারি আয়ের অন্যতম উৎস।

ii) বিভিন্ন বৃত্তির উপরেও কর আরোপিত হত। কাংস্যকার, বস্ত্রশিল্পী, অস্ত্রনির্মাতা, সুরা প্রস্তুতকারী, তাঁতি, চর্মকার, সূত্রধর, নাপিত, কুমোর প্রভৃতি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের উপর কর ধার্য হত।

iii) লবণ উৎপাদনেও রাষ্ট্র কর বসত।

AMBITION
2015 (Final)

iv) বাণিজ্যের উপর কী পরিমাণ কর ধার্য হত তা বলা দুরূহ। শুল্ক ছিল অন্যতম বাণিজ্য কর। যারা আদায় করতেন তাদের বলা হত 'শৌল্কিক'। বিদেশ - প্রত্যাগত এবং বিদেশযাত্রায় উদ্যত - দুধরণের বণিকের কাছ থেকেই কর আদায় করা হত।

ঘ) এই যুগে দমনমূলক করের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 'বিষ্টি' বা বাধ্যতামূলক বেগার শ্রমদান ছিল এই জাতীয় করের উদাহরণ। বাকাটক রাজাদের শিলালিপিতে এই জাতীয় বেশ কিছু করের উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগে রচিত কামসূত্রে উল্লেখ আছে যে - কৃষক রমণীরা বিনা পারিশ্রমিকে স্থানীয় ভূস্বামীদের শস্য ঝাড়াই বাছাই ও গোলায় শস্য ভর্তি করত।

ঙ) বাকাটক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, নিয়মিত রাজস্বের পাশাপাশি প্রজাবর্গের উপর অনিয়মিত এবং নিয়ম বহির্ভূত উপঢৌকন আরোপ করা হত। রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী গ্রামে গেলে তারা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দুধ, মধু, ফল, ফুল, চর্ম, অঙ্গার, বৃষ, ধেনু প্রভৃতি উপঢৌকন আদায় করত। এর ফলে কৃষক সম্প্রদায়ের উপর যে প্রচন্ড চাপ পড়ত তাতে সন্দেহ নেই।

চ) কর্মচারীদের বেতনের উপর কর ধার্য করা হত। একে বলা হত 'ভোগ'।

সংক্ষেপে এই ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের কর ব্যবস্থা।

ছ) বাংলার সেন বংশ।

উত্তর ঃ- খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের অন্তিম ভাগে পাল শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর সেন বংশের উত্থান ঘটে।

সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা - বাংলার সেন রাজাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন কর্ণাটের অধিবাসী। কোন একসময় তাঁরা ছিলেন বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। অনেকে মনে করেন তিনি পাল রাজাদের একজন সামন্ত ছিলেন।

বিজয় সেন (প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা) (১০৯৮ - ১১৫৮ খ্রীঃ) - বিজয় সেন হলেন স্বাধীন সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায় তিনি গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ, মগধ প্রভৃতি রাজাদের পরাজিত করে এক বিশাল রাজ্য গড়ে তোলেন। মিথিলা এবং পূর্ববঙ্গের যাদব বংশের রাজাদেরও তিনি পরাজিত করেন। তাঁর দুটি রাজধানী - পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর আর পশ্চিমবঙ্গের বিজয়পুর।

বল্লাল সেন (১১৫৮ - ১১৭৯ খ্রীঃ) - বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনও রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর হন। 'বল্লালচরিত' - এ বল্লাল সেনের মগধ ও মিথিলা জয়ের কথা জানা যায়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে বঙ্গ, বরেন্দ্রভূমি, রাঢ়, বাগড়ী ও মিথিলা পাঁচভাগে ভাগ করেন। তিনি কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। তাঁর আমলেই মালদহের সন্নিকট গৌড় নগরী নির্মিত হয়। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

লক্ষণ সেন (১১৭৯ - ১২০৬ খ্রীঃ) - বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেনের আমলেও সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয়। লক্ষণ সেনের সাম্রাজ্য পূর্বে কামরূপ, উত্তরে বরেন্দ্রভূমি, পশ্চিমে এলাহাবাদ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর উপাধি ছিল 'গৌড়েশ্বর', 'অরি - রাজ - মর্জন - শঙ্কর', 'পরম বৈষ্ণব'। জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি ধর, হলায়ুধ, ... তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর সময়ে তুর্কি আক্রমণ ঘটলে তিনি পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান।

বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন - লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন (১২০৬ - ১২২৫ খ্রীঃ) এবং কেশব সেন (১২২৫ - ১২৩০ খ্রীঃ) পর পর সিংহাসনে বসেন। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ তাঁদের অধিকারে ছিল। তাঁরা উভয়েই 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন।

সেন সাম্রাজ্যের পতন - কেশব সেনের পরও কয়েকজন সেন রাজা সিংহাসনে বসেন। তবে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং মুসলিম আক্রমণের ফলেই সেন বংশের অবসান ঘটে।

গুরুত্ব - ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন ''বাংলার ইতিহাসে সেনযুগ হল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়''।

i) পালযুগের অবসানের পর বাংলার অনৈক্য ও অরাজকতা দমন করে সেন রাজারা বাংলাকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন।

ii) সাহিত্য, ধর্ম, শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এই যুগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বল্লাল সেনের 'দানসাগর', 'অদ্ভুত সাগর', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', ধোয়ীর 'পবনদূত', গোবর্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী', উমাপতি ধরের 'বিজয়সেন প্রশস্তি' উল্লেখযোগ্য লেখা। এযুগের বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন - শূলপাণি, সূত্রধর, বিষ্ণুভদ্র, কর্মভদ্র, তথাগতসার প্রমুখ।

জ) পল্লব রাজা প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ।

উত্তর ঃ- খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধে সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের পর কৃষ্ণা নদীর তীরে কাঞ্চী নগরকে কেন্দ্র করে পল্লব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লব বংশের অন্যতম নরপতি ছিলেন প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ (৬০০ - ৬৩০ খ্রীঃ) - সিংহবিষ্ণুর পর তাঁর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ সিংহাসনে বসেন।

i) প্রথম মহেন্দ্রবর্মণের আমলে পল্লব - চালুক্য সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে। তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরে ছিল

AMBITION
2015 (Final)

চালুক্য এবং দক্ষিণে পল্লব রাজ্য। একে অপরের শক্তি বৃদ্ধিতে এরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে পরাজিত হন এবং বেঙ্গী প্রদেশটি তাঁর হস্তচ্যুত হয়।

ii) বিবিধ গুণাবলীর অধিকারী মহেন্দ্রবর্মণ ত্রিচিনোপল্লি, আর্কট, চিঙ্গলপেট জেলায় বহু সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করেন।

iii) তিনিই প্রথম ইট ও কাঠের পরিবর্তে পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণ শুরু করেন।

iv) নাট্যকার ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত ব্যাঙ্গ - নাটক 'মত্তবিলাস প্রহসন' সংস্কৃত ভাষায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

v) তিনি চিত্রকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

vi) তিনি 'গুণভার' উপাধি ধারণ করেন।

vii) ভারবি, দন্দীন প্রমুখ গুণী সাহিত্যিকরা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেন।

viii) ধর্মীয় দিকে তাঁর উদারতার অভাব ছিল না। তিনি প্রথম জীবনে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরে শৈবধর্ম গ্রহণ করেন।

ix) বিবিধ গুণাবলীর জন্য তাঁকে 'বিচিত্রচিত্ত' বলত জনসাধারণ।

x) বহু মন্দির নির্মাণের জন্য তিনি 'চৈত্যকারী' বলে পরিচিত ছিলেন।

xi) তিনি 'পল্লবমল্ল' নামেও পরিচিত ছিলেন।

ট) প্রথম পাণিপথের যুদ্ধের গুরুত্ব ।

উত্তর ঃ-১৫২৬ খ্রীঃ ২১শে এপ্রিল দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদী এবং ফারগানার শাসক বাবরের মধ্যে প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধের গুরুত্বগুলি হল -

i) এই যুদ্ধের ফলে লোদী বংশের শাসন ক্ষমতা চিরতরে অবলুপ্ত হয়।

ii) আফগানদের ক্ষমতা খর্ব হয়।

iii) দিল্লী, আগ্রা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাবরের অধিকারে আসে। জৌনপুর পর্যন্ত সমৃদ্ধশালী গঙ্গাযমুনা উপত্যকার দরজা তাঁর সামনে উন্মুক্ত হয়।

iv) আগ্রার সঞ্চিত ইব্রাহিম লোদীর ধনদৌলত বাবরের হস্তগত হওয়ায় তাঁর আর্থিক সংকট কিছুটা দূর হয়।

v) বাবরের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়।

vi) ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দূর্বলতা প্রমাণিত হয়।

vii) ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচিত হয়।

ঐতিহাসিক Dr. S. Roy বলেন যে - পাণিপথের যুদ্ধের ফলে লোদী শাসনের অবসান ঘটে মাত্র। এর বেশি কিছু নয়, বাবর কেবলমাত্র দিল্লীর সিংহাসনই দখল করেন - সমগ্র ভারত নয়।

Dr. Satish Chandra - র মতে রাজনৈতিক দিক থেকে পাণিপথের যুদ্ধকে কখনোই চুড়ান্ত বলা যায় না - বরং বলা যায় যে, এই যুদ্ধ উত্তর ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের সংগ্রামে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

Dr. K. K. Dutta - র মতে পাণিপথের যুদ্ধ ছিল ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ বা প্রথম সোপান মাত্র।

গুরুত্বের দিক থেকে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধকে পলাশির যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের জয়লাভ যেমন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হয়, তেমনি পাণিপথের যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের ফলে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম ভিত্তি রচিত হয়। আরও দুটি যুদ্ধ জয়ের প্রয়োজন ছিল - ক্লাইভের ক্ষেত্রে বক্সারের যুদ্ধ এবং বাবরের ক্ষেত্রে খানুয়ার যুদ্ধ।

AMBITION

2015 (Final)

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীল পত্র (ASSIGNMENT) ডিসেম্বর, ২০১৫ ও জুন ২০১৬

ইতিহাস (History)

সহায়ক পাঠক্রম (Subsidiary)

AMBITION

[S-2, SHI-II (New) : Early Modern and Modern India (1707-1964)

New Syllabus : (From July 2010 Enrolment Session)

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

ক) ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের তাৎপর্য বিশ্লেষন করুন ?

উত্তর ঃ- ১৭৬৫ খ্রীঃ বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে দেওয়ানী সনদ পেয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার লাভ করে। বাংলার নবাব মীরজাফরের পুত্র নাজিম উদ দৌল্লার সাথে একটি পৃথক চুক্তি করে ক্লাইভ বর্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা বৃত্তির বিনিময়ে বাংলার রাজস্বের ওপর সকল দাবি ত্যাগে নবাবকে বাধ্য করেন। এর ফলে যে অদ্ভুত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল তা 'দ্বৈতশাসন' নামে পরিচিত। এই অবস্থায় রাজস্ব সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ, সামরিক বিভাগ প্রভৃতির অধিকার রইল কোম্পানীর হাতে। নবাবের হাতে রইল পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব। অর্থসম্পদের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে কোম্পানী হল প্রকৃত শাসক। নবাব পরিণত হলেন বৃত্তিভোগী নামেমাত্র শাসক। কোম্পানী পেল দায়িত্ববিহীন ক্ষমতা, নবাবের রইল ক্ষমতাবিহীন দায়িত্ব।

এই দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করে কোম্পানী রাজস্ব সংগ্রহের ভার অর্পণ করে রেজা খাঁ এবং সিতাব রায় নামে দু'জন নায়েবের উপর। এরা শুধু রাজস্ব এবং শুল্ক আদায় করতেন না, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারও করতেন। নামে নবাবের কর্মচারী হলেও বাস্তবে তাঁরা কোম্পানীর স্বার্থরক্ষা করতেন।

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। প্রশাসনিক দায়িত্ব নবাবের থাকলেও আর্থিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা তার ছিল না। রাজস্বভোগী কোম্পানী দায়িত্ব বিহীন হওয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করায় কোম্পানীর কোনো আগ্রহ ছিল না। বরঞ্চ অধিক লাভের আশায় কোম্পানী উৎপীড়ন করে রাজস্ব বৃদ্ধি করতেই আগ্রহী ছিল। এই অবস্থায় কোম্পানী ও নবাবের কর্মচারীরা ব্যক্তিগত লাভের জন্য শোষণ উৎপীড়নে লিপ্ত হয়। ফলে জনগণের দূর্দশার অন্ত ছিল না। বাংলার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অন্যতম কারণ এই শোষন-উৎপীড়ন।

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার ফলে বাণিজ্য পদ্ধতির পরিবর্তন হয় এবং উদ্ভব হয় কোম্পানীর 'Investment' বা অর্থ বিনিয়োগ প্রথা। ভারতে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য এতদিন কোম্পানী ইংল্যাণ্ড থেকে অর্থ নিয়ে আসত। কিন্তু ১৭৬৫ সাল থেকে নিয়ন্ত্রনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে কোম্পানী বাংলার রাজস্ব থেকেই ক্রয়করে বিদেশে পাঠিয়ে প্রচুর মুনাফা লাভ করতে থাকে। বাংলার সম্পদ এর ফলে ইংল্যাণ্ডে পাচার হতে থাকে। স্ফীত হয়ে ওঠে কোম্পানীর মুনাফা। ইংরেজদের সরকারি হিসেব অনুযায়ী ১৭৬৬-'৬৮ এই তিন বছরে বাংলা থেকে ৫কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এইভাবে বিলেতে পাচার হয়েছিল।

এইভাবে দেওয়ানী লাভের ফলে একদিকে বাংলায় চলে শোষণ উৎপীড়ন অন্যদিকে বাংলার সম্পদ পাচার হতে থাকে ইংল্যাণ্ডে। ঐতিহাসিক জন কে বলেছেন, দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি আরও বৃদ্ধি করেছিল। এদেশের শিল্প ও কৃষির উপর দেখা দিয়েছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

দেওয়ানী লাভের ফলে সামরিক শক্তির দ্বারা কোম্পানী যাতে সুবিধা ও অধিকার লাভ করেছিল তা আইনসঙ্গত স্বীকৃতি পায়। বাস্তবে ক্ষমতাহীন হলেও জনগণের চোখে মুঘল সম্রাট ছিলেন ভারতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সম্রাটের কাছ থেকে সনদ লাভের পর কোম্পানীর অধিকার জনগণের স্বীকৃতি লাভ করে। দেওয়ানী লাভের ফলে বাংলার নবাব শুধু নামসর্বস্বে পরিণত হল। রাজস্ব নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে কোম্পানী বাংলার প্রকৃত শাসকে পরিণত হয়। অর্থের প্রয়োজনে নবাব ছিলেন সম্পূর্ণভাবে কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল।

2015 (Final)

গ) ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণার তাৎপর্য কী ছিল ?

উঃ– ১৮৫৭ এর প্রবল বিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ তখন উপলব্ধি করেন যে, এত বড় সাম্রাজ্যের শাসনভার একটি কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। এজন্য ১৮৫৮ খ্রীঃ একটি ভারত শাসন আইন পাশ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের শাসনভার সরাসরি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে তুলে দেয় এবং এই সঙ্গে অবসান হয় দীর্ঘকালের "কোম্পানীর শাসন"।

"মহারাণীর ঘোষণা পত্রে (১৮৫৮) কোম্পানীর শেষ গর্ভনর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে মহারাণীর প্রতিনিধি বা ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। এই ঘোষণাপত্রের দেশীয় রাজ্যগুলি অধিগ্রহণ করা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আরো বলা হয় যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীকে যোগ্যতা অনুসারে উচ্চ রাজকার্যে করা হবে।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী ভারতের ইতিহাস ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে দেশীয় রাজন্যবর্গের পরাজয়ের ইতিহাস। এই সুযোগে কোম্পানি তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু একশত বৎসর পর ১৮৫৭ সালে কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে না হলেও ব্যাপকভাবে ভারতে এক মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অভ্যুত্থান ও ব্যাপ্তি ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক ও তদজনিত লাভ কাজেই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কোম্পানির পক্ষে অনুচিত কাজ হয়েছে। লর্ড পামারস্টোন উন্নততর শাসন ব্যবস্থা ভারতে প্রচলন করার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে বিল উপস্থাপন করেন। কোম্পানি তাদের একশত বৎসরের একচেটিয়া অধিকার ছেড়ে দিতে সহজে রাজী হয়নি। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত নিতেন ব্রিটেনের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সদস্যবৃন্দ।

১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট জারী করার পর থেকেই কোম্পানির ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো বাণিজ্যিক সংস্থার উপরে ভারতের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া যথাযথ হবে কিনা। ইংল্যাণ্ডে টোরি এবং হুইগ উভয় দলই কোম্পানির আধিপত্য খর্ব করার পক্ষে ছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ কোম্পানির অন্তিম মুহুর্তটিকে ত্বরান্বিত করে।

১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণার তাৎপর্য ঃ–

~~১৮৫৮ সালের ১ইলা নভেম্বর মহারাণী~~ ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানির শাসনের অবসান হয়। প্রশাসনিক ব্যাপারে মহারাণীর তরফ থেকে সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হয় ভারত সচিবকে। ভারতের যাবতীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য একটি কাউন্সিল বা উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হয়। ভারত সচিব এই কাউন্সিলের সাহায্যে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন।

মহারাণীর ঘোষণায় দেশীয় রাজাদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ভবিষ্যতে তাদের রাজ্য অধিগ্রহণ করা হবে না, এবং হিন্দু রাজাদের উত্তরাধিকারত্ব সংক্রান্ত আইনে দত্তক পুত্রের বৈধ অধিকার মেনে নেওয়া হবে। মহারাণীর ঘোষণায় ভারতবর্ষের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রশাসনিক ব্যাপারে ভারতীয় রীতিনীতি সংস্কারের কথা মনে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলা হয়, সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে ভারতীয়রা ইংরেজদের মতোই সমান সমান সুযোগ সুবিধা পাবে বলে ঘোষণা করা হয়।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে যে আইন গৃহীত হয় তাতে সামরিক পুনর্গঠনের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দেশীয় সিপাহীদের সংখ্যা হ্রাস করে ইউরোপীয় সিপাহীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে হিন্দু মুসলমান ঐক্যে কোনও চিড় ধরেনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থায়িত্বের পক্ষে অনুকূল নয় একথা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ সরকার ভারতে বিভাজন নীতি অনুসরণ করে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হয়। বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ সর্বত্র সেনাবাহিনীতে পূর্বের মতই উচ্চপদগুলি ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণে রইল।

মহারাণীর ঘোষণার প্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনীর পুনর্বিন্যাস বিশ্লেষণ করাকালীন মনে রাখতে হবে যে ভারতের যে অঞ্চলগুলিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল সেই অঞ্চলের লোকজনদের সামরিক বাহিনীতে স্থান না দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। শিখ, গোর্খা, পাঠান, যারা ইংরেজ সরকারকে মহাবিদ্রোহের সময়ে সাহায্য করেছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে তাদের নিয়োগ করা হয়। ভারত সচিব চার্লস উড তৎকালীন বড়লার্ট ক্যানিংকে বলেছিলেন যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে জাতি সম্প্রদায়গত বিভেদ মাথায় রেখে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তাদের মধ্যে কোনওরকম ঐক্যবোধ গড়ে উঠতে না পারে। এছাড়া গোলন্দাজ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে রইল ইংরেজদের হাতে।

দেশীয় রাজ্যগুলি মহারাণীর ঘোষণায় আশ্বস্ত হলেও এই ঘোষণার মূল অর্থ ছিল দেশীয় রাজ্যগুলির উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব বিস্তার। রেলপথে প্রতিটি রাজ্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। পররাষ্ট্র

AMBITION
2015 (Final)

নীতি বা নিরাপত্তা বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারটি পরিচালনার ব্যাপারে দেশীয় রাজাদের স্বাধীনতা ছিল না বললেই চলে। ইংরেজ সরকার ইচ্ছা করলে যেকোনও দেশীয় রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ঐ বংশের অন্য কাউকে সিংহাসনে বসাতে পারত।

কোম্পানী অর্থনীতির দিক দিয়ে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল মহাবিদ্রোহের ফলে। সরকারি আয়ের হৃদপিণ্ড ছিল ভূমিরাজস্ব। বিদ্রোহের পর প্রশাসনিক দায়িত্ব যখন ব্রিটিশ রাজ্যের হাতে চলে আসে, তখন অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য বাৎসরিক বাজেট, নিয়মিত হিসাব পরীক্ষা ব্যবস্থা, সরকার অর্থদপ্তরের পুনর্গঠন এবং সরকারি অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ করা হয়।

মহারাণীর ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে ভারতীয়দের ধর্ম ও সমাজ জীবনে ইংরেজদের কোনও ভূমিকা থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ একথা প্রমাণ করেছিল যে ভারতীয়দের ধর্ম ও সমাজজীবনে হস্তক্ষেপ করার ফল ভালো হয়নি।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

ক) ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ইজারাদারী বন্দোবস্ত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

উত্তর ঃ- ওয়ানের হেস্টিংস - এর ইজারাদারী বন্দোবস্ত ঃ

১৭৭২ খ্রীঃ এক অতি সংকটময় মুহূর্তে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর পদে নিযুক্ত হন (১৭৭২ - ৮৫ খ্রীঃ)। সে যুগে কোন বিদেশীর পক্ষে ভারতীয় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, তার সমস্যাবলী ও সমাধানের পথ নির্নয় করা সহজ ছিল না। ওয়ানের হেস্টিংস - এর সমগ্র শাসনকালটিই হল ভূমিরাজস্ব সম্পর্কে পরীক্ষা - নিরীক্ষার যুগ। এই সব পরীক্ষা - নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন মাত্র - সমাধানে পৌঁছতে পারেন নি।

ইজারাদারি ব্যবস্থার বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য - বাংলার শাসনভার হাতে পেয়ে হেস্টিংস -

i) কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে প্রথমেই দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটান (১৭৭২, এপ্রিল) এবং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সরাসরি কোম্পানী গ্রহণ করে।

ii) নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁ ও সিতাব রায় পদচ্যুত হন এবং পদ দুটি বিলোপ করা হয়।

iii) সরকারি কোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

iv) গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে একটি 'রাজস্ব বোর্ড' বা Board of Revenue গঠিত হয়। এই রাজস্ব বোর্ডের উপর দেওয়ানি সংক্রান্ত সকল বিষয়ের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

v) রাজস্ব আদায়ের জন্য গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিলের চারজন সদস্য নিয়ে একটি ভ্রাম্যমান কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি জেলায় জেলায় ঘুরে ইজারাদারদের নিলামে জমি বন্দোবস্ত করে দেয়। এই ব্যবস্থাই 'ইজারাদারি ব্যবস্থা' নামে পরিচিত (১৭৭২ - ১৭৭৬ খ্রীঃ)।

vi) ইতিপূর্বে 'সুপার ভাইজার' নামক ইংরেজ কর্মচারীরা জেলায় কোম্পানীর রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় তদারক করত। হেস্টুংস এদের নামকরণ করেন 'কালেক্টর। এই সব ইংরেজ কর্মচারী জেলায় রাজস্ব আদায় এবং বিচার ও শাসন পরিচালনার দায়িত্ব পায়, তাকে সাহায্য করত একজন ভারতীয় দেওয়ান।

বৈশিষ্ট্য -

a) যে ইজারাদর কোম্পানিকে সর্বোচ্চ কর দিতে রাজি হল তাকেই নিলামে "জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হল।

b) পাঁচ বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত বলে এই ব্যবস্থা 'পাঁচশালা বন্দোবস্ত' নামেও পরিচিত।

ত্রুটি - ইজারাদারি বন্দোবস্তে নানা অসুবিধা দেখা দেয়।

i) অসাধু ইজারাদাররা বহুক্ষেত্রে বেশি রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালাত।

ii) নিলামের মাধ্যমে জমি ইজারা দেওয়ার ফলে চিরাচরিত জমিদাররা অনেকেই জমিদ্রারিচ্যুত হন এবং তার স্থান দখল করে একদল ভুঁইফোড় ইজারাদার।

iii) বহুক্ষেত্রে কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেরা বেনামে জমিদারি ইজারা নিত।

iv) নবনিযুক্ত ইজারাদাররা বহু ক্ষেত্রেই কোম্পানীকে ঠিকমতো রাজস্ব দিত না এর ফলে কোম্পানীর আয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

v) জমিতে ইজারাদ্রারদের স্বত্ব অনিশ্চিত হওয়ায় তারা জমি ও কৃষকের উন্নতির দিকে নজর দিত না।

এইসব অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে হেস্টিংস ১৭৭৭ খ্রীঃ 'একসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। এই ব্যবস্থায় প্রতি বছর নিলামের মাধ্যমে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত।

ফলাফল - হেস্টিংস এর এই রাজস্ব সংস্কার কোনভাবেই সাফল্য মন্ডিত হয়নি। আসলে এটা ছিল পরীক্ষা -নিরীক্ষা সাফল্য নয়। তাঁর এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রজাবর্গের কোন মঙ্গল হয়নি এবং তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং রাজস্ব

AMBITION
2015 (Final)

সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি পায়। একদিকে জমিদারের উপর রাজস্ব আদায়কারী এবং অন্যদিকে কৃষকের উপর জমিদারের অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও জমির মালিকানা অনিশ্চিত হওয়ায় জমির উন্নয়ন ব্যাহত হয়। ডঃ তারাচাঁদ বলেন যে হেস্টিংসের রাজস্ব নীতির ফলে বাংলার প্রাচীন জমিদারদের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যায় এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকার মেধাহীন নিম্নশ্রেণীর মানুষদের নিয়োগ করতে বাধ্য হয়।

ঙ) বাংলার নবজাগরণের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষন করুন।

উত্তর ঃ- বাংলায় নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য ঃ

ইউরোপীয় নবজাগরণের মত উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের চিন্তাজগতে এক প্রচন্ড আলোড়ন দেখা দেয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দর্শন চেতনা, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও বিজ্ঞান চেতনা এক সামগ্রিক চিন্তাধারার পরিবর্তন নিয়ে এল, সেই পরিবর্তনই রূপ পেল নতুন করে ভাষা ও সাহিত্য চর্চায়, যুক্তিশীল মানসিকতায়, সমাজ সংস্কার চিন্তায় এবং মূল্যবোধের জগতে মৌলিক পরিবর্তনে। এই পরিবর্তনকে 'নবজাগরণ' বা 'Renassance' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই নবজাগরণের বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ -

১) ধর্মের যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ - নবজাগরণের প্রভাবে যুক্তির ভিত্তিতে ধর্মতত্ত্বকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা দেয়। কুসংস্কারের আবর্জনা থেকে হিন্দুধর্মের মূল নীতিগুলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়। যুক্তিবাদের প্রভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। একেশ্বরবাদ প্রচারের ফলে বর্ণভেদ ও বর্গের ভিত্তিতে বিভক্ত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়, কুসংস্কারের প্রভাবে গঙ্গাবক্ষে শিশু বিসর্জন, পর্দা প্রথা, বাল্য ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে মতাদর্শ গড়ে উঠতে শুরু করে।

২) বিজ্ঞান চেতনা - যুক্তিবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ। মনগড়া ধারণার অপেক্ষা তথ্য প্রমাণ ভিত্তিক ধারণা শিক্ষিতজনের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। জীবন চেতনার প্রভাবে জীবন বোধকেও নূতনভাবে বিচার করা হয়।

৩) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন - বাঙালী ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা লাভ করতে চেয়েছিল। জ্ঞানের প্রয়োগশীলতার উপর গুরুত্ব দিতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেজন্য প্রাচীন মূল্যবান জ্ঞান সম্পদ কে বর্জন করতে হবে এমন কথা নয়। প্রাচ্যের যা কিছু মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদ তা গ্রহণ করে তার সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যা কিছু মূল্যবান সম্পদ তা গ্রহণ করে উভয় সংস্কৃতির মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন ই নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪) মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস - নবজাগরণের ফলে প্রাচীন সাহিত্য নব মূল্যায়ন শুরু হয়। দৈব প্রধান কিংবা ভক্তি প্রধান পদ্যের বদলে তৈরী হল গদ্য সাহিত্য। এখন সাহিত্যের নায়ক হল মানুষ -আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন মানুষ। বাস্তবতা ভিত্তিক দেশীয় গদ্যের চর্চা, দৈব বাদ দিয়ে মানুষের কথা নিয়ে সাহিত্যের নবরূপায়ণ, সাহিত্য চর্চার পাশ্চাত্য রীতি কৌশল প্রয়োগ নবজাগরণের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৫) স্ত্রী স্বাধীনতা - নবজাগরণের ফলে স্ত্রী স্বাধীনতা স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে নারীর ব্যক্তি সত্তাকেও স্বীকার করা হয়।

৬) নারীমুক্তি - নবজাগরণের প্রভাবে নারীমুক্তির স্বপক্ষে মতাদর্শ গড়ে ওঠে। নারীমুক্তির আন্দোলনও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে।

৭) ব্যক্তি স্বাধীনতা - ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের চেতনা সৃষ্টি হয়।

৮) সামাজিক পরিবর্তন - ঊনবিংশ শতকে সমাজ জীবনে সঞ্চারিত হয় এক নূতন গতি। সমাজ জীবনে এল এক নূতন নীতি বোধ। এল এক বিরাট পরিবর্তন। সুদীর্ঘকালের কূপমন্ডুকতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবন থেকে বাঙালী মুক্তিলাভ করে। চিরাচরিত সামাজিক স্তরভেদ ভেঙে সমাজজীবনে নূতন উত্থান শুরু হয়, সামাজিক ব্যাভিচার, অন্ধ আচার - অনুষ্ঠান, কুসংস্কার, বর্ণভেদ এবং বর্ণের ভিত্তিতে নানা অবিচার প্রভৃতির ফলে ভারত তথা বাংলাদেশের সমাজে যে স্থবিরতা এসেছিল তা থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করল।

৯) বিশ্ব মানবতাবাদ - উনবিংশ শতাব্দীতে যে নূতন ভাবাদর্শ সৃষ্টি হয় তার ফলেই সৃষ্টি হল আধুনিক জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ ও বিশ্বমানবতাবাদ। বিশ্বমানবতাবাদের প্রভাবে পৃথিবীর মানুষ স্বাধীনতা - পরাধীনতা, যুদ্ধ ও শান্তি, জয় পরাজয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক প্রভৃতি সম্বন্ধে গভীর আশ্রয় বোধ করে। এভাবেই ভবিষ্যত আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রথম ধ্যানধারণা সৃষ্টি হল।

১০) পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তার ব্যবহারিক সুফলের প্রতি আস্থা - সমাজজীবনে আলোড়নের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আত্ম সচেতনতা ও আত্ম সমীক্ষার সুযোগ ঘটে। বলিষ্ঠ সমাজ গড়ার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। নবজাগরণের নেতৃবৃন্দ আধুনিক ভারত গড়ার জন্য ইংরেজী শিক্ষার দাবী জানায়। এর অর্থ

AMBITION
2015 (Final)

ইংরেজের কাছে দাসত্ব গ্রহণ করা বা তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা নয়। এর দ্বারা আধুনিক চিন্তাভাবনা ও আত্মচেতনার প্রকাশই বোঝায়। উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষাপ্রসারকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

১১) নবজাগরণের ফলে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটে।

১২) সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হয়।

তবে নবজাগরণের উপরিউক্ত এই বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলনা। নবজারণের প্রভাব কেবলমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৃহত্তর জনমানসের কাছে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। নবজাগরণের ফলে অশিক্ষিত জনজীবন থেকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা দূর করা যায়নি। জনশিক্ষার চেতনা বিংশ শতকের আগে সুস্পষ্ট রূপ লাভ করতে পারেনি। এতৎ সত্ত্বেও বলা যায় নবজাগরণের প্রভাবেই জীবনের মূল গতিপথের সন্ধান মিলেছিল।

AMBITION

জ) পাকিস্তান আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা কী ছিল ?

উঃ– বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় ইংরেজ সরকারের সার্থক বিভেদ নীতি মুসলমান সম্প্রদায়কে তা থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী, ইংরেজ সরকারের এই টোপ মুসলমানরা সহজেই গ্রহণ করেছিল। তাদের অধিকাংশজনই বিশ্বাস করতো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হিন্দুদের আন্দোলন এবং তা থেকে মুসলমানদের দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। যে আন্দোলন ছিল গোটা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক তা হয়ে দাঁড়াল মুসলমানদের চোখে কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে মঙ্গলজনক। ধর্মনিরপেক্ষ যুক্ত আন্দোলনের প্রথম সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল সৈয়দ আহমেদের হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক নয়, এহেন ঘোষণা। সৈয়দ আহমেদের এই মতবাদ যেন পাকিস্তান দাবির প্রথম ইঙ্গিত বহন করেছিল। উত্তর ভাগের কোন কোন অঞ্চলের চাকুরী, শিক্ষা ও স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার নির্বাচন পদ্ধতির ভিতর দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব পূর্ব ভারতের মুসলমান দৃষ্টিভঙ্গিকে পৃথকমাত্রা দিয়েছিল। আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মুসলমান সমাজ সহজেই সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে পড়ে।

১৯০৬ এ ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। লীগের প্রধান প্রচার ছিল দেশের বৃহত্তম ও মহত্তম স্বার্থও যদি মুসলমানদের স্বার্থ বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন করে তবে মুসলিম স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ১৮৮৫ সালের পর থেকে সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের লক্ষ্য সফল করার যে প্রয়াস চলেছিল ১৯০৬ এ তা পূর্ণ হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদ রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মুসলিম লীগ শুধুমাত্র মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। আলিগড় আন্দোলনের আদর্শ ও লক্ষ্যকে ভিত্তি করে লীগের আদর্শ গড়ে ওঠে। মুসলীম লীগকে সন্তুষ্ট করার জন্য ১৯০৯ এ মর্লে মিন্টো সংস্কারের মুসলমান সম্প্রদায়কে আইন সভায় পৃথক সদস্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। এইভাবে ভারতের অধিকার দেওয়া হয়। এইভাবে ভারতের রাজনীতি দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবেশ ঘটে। যদিও মুসলমানদের এত আমল দেওয়া কিছুতেই উচিত হয়নি বলে ১৯০৯ সালের ১১ই নভেম্বর মর্লের কাছে মিন্টো স্বীকার করেছেন কিন্তু দুজনেই অন্য কিছু করার ব্যাপারে প্রয়োজন অনুভব করেননি।

৩। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন বা সংক্ষেপে উত্তর দিন (যে কোনো চারটি)

ক) বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪)।

উত্তর ঃ- ১৭৬৪ খ্রীঃ বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একদিকে ছিলেন বাংলার নবাব মিরকাশিম, মোগল সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যার শাসক সুজা উদ্ দৌলার যৌথ বাহিনী এবং অন্যদিকে হেক্টর মুনরোর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী।

গুরুত্ব - বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে বক্সারের যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐতিহাসিক স্মিথ এর মতে - ''পলাশির যুদ্ধ ছিল কয়েকটি কামানের লড়াই, বক্সার ছিল ইংরেজদের চূড়ান্ত বিজয়।'' - বলা বাহুল্য বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী -

i) বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের ফলে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোম্পানীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ii) মিরকাশিমের পরাজয় বাংলার স্বাধীন নবাবির অবসান ঘটায়।

iii) এই যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব ও মোগল সম্রাট পরাজয় হওয়ায় উত্তর ভারতে কোম্পানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

iv) এই যুদ্ধের পর বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কোম্পানীর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হওয়ায় দেশীয় শিল্পের অবক্ষয় ঘটে।

v) বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানী ও তার কর্মচারীরা অবাধে বাংলায় লুণ্ঠন শুরু করে।

vi) এই যুদ্ধের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা - বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। এতদিন পর্যন্ত বাংলায় কোম্পানীর আধিপত্য স্থাপন, সার্বভৌমত্ব বা রাজস্ব আদায়ের কোন বৈধতা ছিল না। দেওয়ানি অর্জনের মাধ্যমে বাংলায় কোম্পানীর আধিপত্য বৈধতা পায়।

2015 (Final)

ম্যালেসন বলেন যে - ''ভারতে বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহগুলির মধ্যে বক্সারের যুদ্ধ হল একটি চূড়ান্ত ফলনির্ণয়কারী যুদ্ধ।''

বিপানচন্দ্রের মতে - ''ভারতের ইতিহাসে বক্সারের এই যুদ্ধটি ছিল সর্বাধিক যুগান্তকারী ও তাৎপর্যময়।

খ) কর্ণওয়ালিস কোড।

উত্তর ঃ- লর্ড কর্ণওয়ালিস বিচার ব্যবস্থার যে সংস্কার সাধন করেছিলেন তার লক্ষ্য ছিল দুটি নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা গঠন এবং সর্বত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। কর্ণওয়ালিস তাঁর লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য বিচার শাসন যেমন ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন তেমনি আইনের ধারা লোকে নথিভুক্ত করেছিলেন। ১৭৯৩-এর বিখ্যাত 'কর্ণওয়ালিস কোর্ড' -এর অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। দেওয়ানী এবং ফৌজদারি আদালতগুলোকে নানা স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। যাতে করে বিচার প্রার্থী পর পর আপিলের মাধ্যমে সুবিচার পেতে পারে। বিচার শাসনের সাথে সাথে আইনের সংস্কার করা হয়েছিল। আগেকার যুগে অলিখিত অস্পষ্টত আইন কানুনের পরিবর্তে কর্ণওয়ালিশ লিখিত এবং সুস্পষ্ট আইন নথিভুক্ত করে পুরাতনকে আধুনীকীকরণ করেছিলেন। ১৮৯৯ কমিশন গঠনের মাধ্যমে ভারতের আইনকে পুরোপুরি দেওয়া হয়েছিল। ভারতে কোম্পানীর সর্বত্র এলাকায় একই আইন অনুসারে বিচার কাজ হতে থাকে। এই ভাবে বিচারগত ব্যাপারে ইংরেজ কোম্পানী ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করলেও ইংরেজ প্রশাসকরা ভারতীয়দের জাতিভেদ দিয়েছিল। ইংরেজদের আইন সংস্কার অন্তত আইনের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

ঘ) ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের তাৎপর্য।

উত্তর ঃ- ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অভ্যুত্থানের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতভেদ রয়েছে। জন কে, জন লরেন্স, রবার্টস প্রভৃতি ইংরেজ লেখকরা এবং স্যার সৈয়দ আহমেদ, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমসাময়িক ভারতীয়রা এই অভ্যুত্থানকে নিছক সিপাহী বা সামরিক বিদ্রোহ বলে মনে করেন। অন্যদিকে নর্টন, ডাফ, ফরেস্ট, হোমস্ প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকরা মনে করেন সিপাইহী অভ্যুত্থান রূপে শুরু হলেও ক্রমশ ব্যাপক অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এই অভ্যুত্থান একটি জাতীয় অভ্যুত্থানের রূপ পায়। সমসাময়িক 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই অভ্যুত্থানকে একটি বিরাট বিপ্লব বলে অভিহিত করে বলেছেন যে শুধু সিপাইহীদের ভিতরেই নয় সারা দেশেই যেন বিদ্রোহ শুরু হয়েছে।

এই অভ্যুত্থানকে যারা জাতীয় সংগ্রাম বা স্বাধীনতা সংগ্রামরূপে স্বীকার করতে ইচ্ছুক নন তারা কয়েকটি যুক্তি উত্থাপন করেছেন। প্রথমত, সুপরিকল্পিতভাবে এই বিদ্রোহ শুরু হয়নি। সিপাহীদের অসন্তোষের ফলে এই অভ্যুত্থান হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, দেশের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে অভ্যুত্থানের প্রসার ঘটেনি। তৃতীয়ত ঃ- অভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভিন্ন ছিল না। আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির সীমিত লক্ষ্য নিয়ে তারা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু এই অভিমত মেনে নেওয়া যায়নি। অধ্যাপক সুশোভন সরকার সঠিকভাবেই বলেছেন যে ইতিহাসের সকল গণঅভ্যুত্থানের চরিত্রই এভাবে চিত্রিত করা যায়। সুপরিকল্পিরভাবে সকল শ্রেণির মধ্যে অভ্যুত্থানের ঘটনা ইতিহাসে বিরল। ঐতিহাসিক নর্টন বলেছেন যে, অযোধ্যার সব স্তরের মানুষই সশস্ত্র অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিল। পলাতক ইংরেজরা কোনো গ্রামেই আশ্রয় নিতে সাহসী হত না। ঐতিহাসিক ফরেস্ট বলেছেন, অযোধ্যা থেকে ইংরেজ শাসক স্বপ্নের ন্যায় বিলিন হয়ে যায়। এই বিদ্রোহ যে শুধু সিপাহীদের বিদ্রোহ ছিল না তার প্রমাণ হিসেবে হোমস্ বলেছেন, বিদ্রোহ ছিল না, তা গণবিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল।

অভ্যুত্থানের গণচরিত্র মেনে নিলে প্রশ্ন ওঠে এই অভ্যুত্থানকে 'জাতীয় সংগ্রাম' বা 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলা যায় কিনা। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার দেশপ্রেম বা জাতীয় চেতনার উন্মেষ সে সময় হয়নি বলে এই অভ্যুত্থানকে স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে স্বীকার করতে ইচ্ছুক নন। এর না ছিল কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, না ছিল কোন সংগঠন। তিনি একে সামন্ততন্ত্রের ও পতনশীল অভিযান শ্রেণির মৃত্যুকালীন কামড় বলে মনে করেন। এই অভ্যুত্থান, তার মতে প্রতিক্রিয়াশীল।

অধ্যাপক সুশোভন সরকার যুক্তি দিয়ে ডঃ মজুমদারের মত খণ্ডন করেছেন।–

প্রথমত ঃ- ঊনিশ শতকে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয়ত হয়নি। কিন্তু জাতীয়তার ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তন হয়েছে। বিদেশি শাসক থেকে যুক্তিলাভের জন্য ব্যাপক গণ অংশগ্রহণের উপর গড়ে ওঠা গণ অভ্যুত্থানকে জাতীয় সংগ্রামরূপে স্বীকার না করা অসঙ্গত। তাহলে ইতালির কার্বোনারি আন্দোলন, নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে রুশ কৃষকদের যুদ্ধকেও জাতীয় সংগ্রাম বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ- পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলির সাথে ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের পার্থক্য ছিল। পূর্ববর্তী অভ্যুত্থানগুলির পেছনে গণসমর্থন থাকলেও ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের বিরাট ব্যাপকতা, একই সময় বিভিন্ন স্থানে অভ্যুত্থান সংগঠিত হওয়া এবং ব্যাপক গণসমর্থনই শুধু নয়, গণ অংশগ্রহণ ও পূর্ববর্তী অভ্যুত্থানগুলির ছিল না।

তৃতীয়তঃ- কোনো সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রাম কিনা তা নির্ভর করে বিদেশী শাসন থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টায় গণ অংশগ্রহণ

AMBITION
2015 (Final)

এবং গণ সমর্থনের উপর। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন, There is not the slightest doubt that the rebets wanted to get rid of the alien gevernment.-

চতুর্থত ঃ- এই বিদ্রোহকে সামন্ত বিদ্রোহ ও প্রতিক্রিয়াশীল বলা যায় না। ১৮৫৭-র ভারতে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা ছিল শক্তিশালী। তাই কোনো সাধারণ অভ্যুত্থান কিছুটা সীমন্ত প্রভাবিত হওয়া ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সুশোভন সরকার সঠিকভাবেই বলেছেন যে, মুক্তির সংগ্রাম যদি জয়লাভ করত তাহলে তা রক্ষার জন্য শক্তির, নতুন কৌশলের, নতুন সংগঠনের আবির্ভাব ঘটত।

পঞ্চমত ঃ - বড় বড় সামন্ত শাসকেরা এই অভ্যুত্থানে যোগ দেয়নি। অযোধ্যার তালুকদাররা ছাড়া অন্যত্র ভূস্বামীরা ইংরেজদের সহযোগিতা করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেণি ও ছিল অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে। কারণ তাদের স্বার্থ ইংরেজ শাসনের মধ্যেই নিহিত ছিল। এই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই ছিল সাধারণ মানুষ, নেতৃত্ব ও এসেছিল ঝাঁসি রাণী, নানা সাহেব, বাহাদুর শাহ সকলের সম্পর্কেই একথা বলা যায়। একমাত্র ব্যতিক্রমী ছিলেন তাঁতিয়া টোপী ও ফৈজাবাদের মৌলবী।

তাই এই অভ্যুত্থানকে সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ বলা যায় না। ব্যাপক গণঅংশগ্রহণের জন্য একে শুধু সামরিক বিদ্রোহও বলা যায় না। অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণি, অভ্যুত্থানের পেছনে গণসমর্থন, প্রভৃতি থেকে একথা বলা অযৌক্তিক নয় যে পূর্ববর্তী শত বছরের বিদেশী শাসন ও শোষন সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল, সিপাহীদের বিদ্রোহে তা প্রকাশ পায় এবং ক্রমশ ব্যাপক গণসমর্থনের ভিত্তিলাভ করে জাতীয় সংগ্রামে পরিণত হয়। নিঃসন্দেহে বিদেশি শাসন ও শোষণের অবসান যে অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা চলে না।

ঝ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ঃ

১৯৩৫ খ্রীঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন ভারত সচিব Sir Samuel Hoare একটি বিল উত্থাপন করেন House of Commons - এ, ১৯৩৫ সালের ২রা আগষ্ট রাজকীয় সম্মতি লাভের পর বিলটি আইনে পরিণত হয়। এই আইনটি হল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন।

আইনের বৈশিষ্ট্য - ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

i) ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে কেন্দ্রে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যাখ্যা করা হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করা সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছাধীন ছিল।

ii) কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও প্রদেশে তা বিলুপ্ত করা হয়।

iii) প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়।

iv) সম্প্রদায়িক ও অপরাপর গোষ্ঠীগুলির জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, মুসলিম সভ্যদের জন্য সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন এবং তপশিলী সভ্যদের জন্য 'পূণা চুক্তি' অনুসারে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

v) সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে গভর্ণর জেনারেল ও প্রদেশ গুলিতে গভর্নরদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়।

শর্তাবলী -

i) কেন্দ্রীয় সরকার - যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার গভর্নর জেনারেল ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার হাতে থাকে। কেন্দ্রে একটি দি - কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হবে এর উপর আইন জনগণের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

ii) প্রাদেশিক গুরুত্ব - প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে গভর্নরের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়।

গুরুত্ব - বেশকিছু ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সত্বেও ভারতের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ১৯৩৫ খ্রী - এর ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আইন স্বাধীন ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ও দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিরচনা করে। এই আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ বাস্তবায়িত না হলেও, সীমাবদ্ধ ভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের নীতি কার্যকর হয়। এর ফলে প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই আইনটির ওপর ভিত্তি করেই ভারতীয় সংবিধান গড়ে ওঠে।

AMBITION

2015 (Final)

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীল পত্র (ASSIGNMENT) ডিসেম্বর, ২০১৫ ও জুন ২০১৬

ইতিহাস (History)

সহায়ক পাঠক্রম (Subsidiary)

[S-3, SHI-III (New) : Early Modern and Modern India (1707-1964)

AMBITION

New Syllabus : (From July 2010 Enrolment Session)

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

খ) তৃতীয় নেপোলিয়ানের পতনের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ঃ-তৃতীয় নেপোলিয়ানের পতনের কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল–

প্রথমত :

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ছিল বিশাল এবং সুবিস্তৃত। তাঁর এত নৌসেনা ছিল না যে সমগ্র ইউরোপের উপকূল অঞ্চলে অঞ্চলে পাহারা দিতে পারবে ফলে ইউরোপের সমগ্র উপকূল জুড়ে ব্রিটিশ পণ্য চোরাপথে আমদানি হতে থাকে। ফলে এই অবরোধ কাগুজে অবরোধ পরিণত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত :

এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে গিয়ে শুধু ফ্রান্সের নয় সমগ্র ইউরোপে আর্থিক সঙ্কটের সূচনা হয়েছিল। ইউরোপীয় দেশগুলি ক্রমশ বুঝতে পারে যে মহাদেশীয় ব্যবস্থা তাদের স্বার্থক্ষুন্ন করছে। ফলে এই আর্থিক সঙ্কটের জন্য নেপোলিয়নকে দায়ী করেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেপোলিয়নকে দায়ী করেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেপোলিয়নকে ঘৃণার চোখে দেখেন এবং বিরাগভাজন হয়। ঐতিহাসিক Markham (মার্কহাম) বলেছেন — "Nepolean also last the confidendce of the French middle class."

তৃতীয়ত :

ফরাসী জনগণের দুর্দশা ও চরম পৌঁছেছিল ফরাসী বন্দর প্রায় শুকিয়ে উঠেছিল, সরকারের বাজসংহ্যায় পাচ্ছিল। কাঁচামালের অভাবে কলকারখানা বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল ফরাসী জনসাধারণের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

চতুর্থত :

নেপোলিয়ন ইউরোপীয় রাজ্যনবর্গকে মহাদেশীয় ব্যবস্থা মানতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ব্রিটিশপন্য ছাড়া অর্থনীতি অচল হয়ে পড়ে। তারা শিল্পসমৃদ্ধ ব্রিটেনের উপরই শিল্পজাত পন্যের ব্যাপারে নির্ভর করত।

পঞ্চমত :

এই ব্যবস্থা সমগ্র ইউরোপের অসন্তোষ সৃষ্টি করে, ফ্রান্সের মিত্ররাষ্ট্রগুলি ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ফলে ফ্রান্সের মিত্র রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নেপোলিয়নের বিরোধ দেখা যায়। ১৮০৬ খ্রীঃ থেকে ১৮১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চলেছিল তার চূড়ান্ত পর্যায়ে নেপোলিয়ানের পতনকে অনিবার্য করে তোলে।

ষষ্ঠত :

এই ব্যবস্থাগুলি নেপোলিয়নের অযোগ্যতার বিরাট প্রমাণ। এই ব্যবস্থা কার্যকারী করতে গিয়ে একে একে স্পেন, পর্তুগালের সঙ্গে বিরোধের সূচনা হয়েছিল। নেপোলিয়ান স্পেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান লিপ্ত হন। জাতীয়তাবোধ জাগরিত স্পেনবাসীরা মেনে নেয় নি। ফলে স্পেন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হন। নেপোলিয়ন তাই বলেন – "The Spen is nuclear ruined me".

সপ্তমত :

2015 (Final)

তাছাড়া নেপোলিয়নের সঙ্গে পোপের বিবাদ সমগ্র ক্যাথলিক ধর্মজগৎ কে রুষ্ট করে তোলে। তাই বলা যায় যে এই মহাদেশীয় ব্যবস্থা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্র নয় ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামরিক ব্যবস্থাতে ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহার ঃ–

পরিশেষে বলা যায় যে মহাদেশীয় ব্যবস্থার কার্যকারী করতে গিয়ে নেপোলিয়ন নিজেই সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। ইংল্যাণ্ডকে জব্দ করতে গিয়ে তিনি নিজেই জব্দ হয়ে যান। তাই তাঁর এই মারাত্মক ভুল - এই ভুলের কোন ক্ষমা নেই।

ঘ) ১৯১৭-এর নভেম্বর বিপ্লবের পটভূমি বিশ্লেষন করুন।

উঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে ১৯১৭ খ্রিঃ রাশিয়ার একটি বৈপ্লবিক আড়োলন সৃষ্টি হয়েছিল। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসি বিপ্লবের পর বিশ্বের ইতিহাসে এত বড় যুগান্তকারী ঘটনা সংগঠিত হয়নি। এত বড় বিপ্লব কোন একটি কারণের ফলে সংগঠিত হয় না, বিভিন্ন শক্তির কার্যের ফলেই সম্ভব হতে পারে। সেই জন্য রুশ বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজের অবস্থার মধ্যে।

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের ন্যায় রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। (১) রাশিয়ার ছাত্র অর্থাৎ সম্রাট কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর সমর্থনে ও পরামর্শে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। অভিজাত শ্রেণীর কার্যের প্রয়োজনের রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারনে সাধারণের কোন অধিকার ছিল না।

(২) এছাড়া রাশিয়ার প্রতিবেশি পদানত দাবিগুলোকে তাদের জাতির সত্তা বিনষ্ট করে বশীকরণের নীতি গ্রহণ করা হয়। ফলে এই সমস্ত স্থানে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠেছিল।

সামাজিক অবস্থা ঃ রাশিয়ার সমাজ কয়েকটি স্তরে স্তরে বিভক্তি ছিল। (১) সর্বোচ্চ ছিল মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণী (২) এই মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর অধীনে ছিল বিশাল কৃষক শ্রেণী। 'মির' নামক গ্রাম্য সমিতিগুলোর আধিপত্য কৃষকদের পদে দুর্বিসহ হয়ে উঠলে তারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মীরগুলোর আধিপত্য হতে মুক্ত হয়। কিন্তু দারিদ্র্যের ফলে জমিতাদের হাতছাড়া হয়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত হতে থাকে। কৃষকশ্রেণী দুর্দশার আর কোন সীমা রইল না। বিপ্লব ছাড়া যুক্তির আর কোন পথ ছিল না। (৩) রাশিয়ার বিভিন্ন কলকারখানায় নিয়োজিত পঁচিশ লক্ষ শ্রমিকের অবস্থা ছিল অনেকটা ভূমিদাসদের সমতুল্য। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন যে বেআইনী ছিল, ধর্মঘট নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণী কেবলমাত্র মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল। (৪) কয়েকটি বৃহৎ সত্ত্ব ছাড়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল সংখ্যায় নগন্য। অর্থনৈতিক অনগ্রসারতার ফলে ব্যবসায়ী ও শিল্প বিপ্লব ও দুর্বল অবস্থার ছিল। রাষ্ট্র বা সমাজে তাদের কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। সুতরাং তারাও একটি পরিবর্তনের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

মানসিক প্রস্তুতি ঃ সমাজে বিভিন্ন স্তরে যে অসন্তোষ পুক্তীভূত হয়ে উঠেছিল তা প্রকাশ পেল রুশ সাহিত্যিকদের ভাষায়। গোর্কি, টলষ্টয়, তুর্গেনিভ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ জনসাধারণের মধ্যে মানুষ হিসাবে তাদের অধিকার ও দাবি সম্বন্ধে চেতনা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছিলেন এবং স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের প্রস্তুত করে তুলেছিলেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ ভূমিদাসদের মুক্তির পর রাশিয়ার জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলে ও অর্থনীতি ছিল আগের মতোই পশ্চাৎপদ। (১) রাশিয়া ছিল মূলত কৃষি প্রধান। শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য ছিল সামান্য। রাষ্ট্র ও সমাজে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য থাকবার ফলে শিল্পোন্নতির পথে পদে পদে বাধাপ্রাপ্তি হত। (২) কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয়। কৃষিকার্যের উপযোগী বেশিরভাগ জমিই ছিল গ্রাম্য অভিজাত সম্প্রদায়ের দখলে চলে গিয়েছিল। তারা কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত না করে কেবলমাত্র কৃষকদের শোষণের মাধ্যমেই লাভবান হবার চেষ্টা করত। (৩) প্রধান প্রধান কলকারখানা যা কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বেশিরভাগের মূলধনের মালিকানা ছিল বিদেশি পুঁজিপতিদের। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক শোষণ ছিল অব্যাহত এবং সমস্ত দেশ বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পেষিত হত। শিল্পায়নের ফলে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক সংকট ঃ রাশিয়ার অভ্যন্তরে যখন এইরূপ অসন্তোষ বিস্তৃতি লাভ করেছিল, তখন প্রথম মহাযুদ্ধে রাশিয়া ক্রমশ পরাজিত হতে থাকে। ফলে জার সরকারের অর্কমন্যতা দেশবাসীর নিকট প্রকাশ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিধস্থ হয়ে পড়ল। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর ঘাটতি দেখা গেল, খাদ্যেরও অভাব হল। ফলে প্রচুর সেনা হতাহত হয় – প্রায় ষাট লক্ষ সেনা প্রাণ বিসর্জন দেয়। সুতরাং দেখা যায় যুদ্ধের ফলে সর্বস্তরের মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়ে ছিল এবং সেনা বাহিনীর মনেও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

লেলিনের ভূমিকা ঃ ১৯০৫ সালে রাশিয়ার বিপ্লব শুরু হলে বলশেভিকরা তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই সময় সাময়িকভাবে তিনি রাশিয়ায় ফিরে আসেন। কিন্তু আবার তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯১৭ সালে মার্চ মাসে বিপ্লবের সময় তিনি সুইজারল্যান্ডে ছিলেন এবং সেখান থেকেই বিপ্লব পরিচালনা করেন। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান হলে জার্মান সামরিক বাহিনীর সাহায্যে তিনি এপ্রিল মাসের রাশিয়ায় ফিরে আসেন।

প্রত্যক্ষ কারণ ঃ জারতন্ত্র অবশ্য কড়া শাসন দ্বারা জনসাধারনের মধ্যে শান্তি বজায় রাখবার জন্য সচেষ্ট হল। কিন্তু

AMBITION
2015 (Final)

বলশেভিক সেনশেভিক ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহের পথে পরিচালনা করে। ১৯১৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে পেট্রোগ্রাডে ধর্মঘটের পর সমস্ত দেশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল এবং এই ভাবে রাশিয়ায় বিপ্লবের সূত্রপাত হল। ১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লব তাই কোন আকস্মিক বিস্ফোরণ ছিল না। দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি রূপে বিপ্লব সূচিত হল। অধ্যাপক E. H. Car মন্তব্য করেছেন 'The Revolution of 1917 was in one sense of sharp break in Russian history and in another along awaited fulfilment of it '।

পরিশেষে বলা যায় রুশ বিপ্লব একটি মাত্র কারণে সংগঠিত হয়নি। বিভিন্ন কারণের মিলিত ফলশ্রুতির ফলে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। এই বিদ্রোহে বলসেভিক দল তথা লেলিনের অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ

খ) ফ্রান্সে প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন ?

উঃ– নেপোলিয়নের পতনের পরে ফ্রান্সের সিংহাসনে ন্যায্য অধিকারের নীতি অনুযায়ী বুরবোঁ বংশের অষ্টাদশ লুইকে বসানো হয়। ফ্রান্সের তখন একদিকে ছিল চরম রাজতন্ত্রীরা প্রাক বিপ্লব স্বৈর রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। উদারপন্থীরা চেয়েছিল বিপ্লবী চেতনাকে রক্ষা করে বিপ্লবপ্রসূত সুফল বজায় রাখতে। অষ্টাদশ লুই মধ্যপন্থা অবলম্বন করে স্বৈর রাজতন্ত্রের সঙ্গে বিপ্লবের ফসলের সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ লুই এর ভাই কাউন্ট অব আরটয়েস ছিলেন উগ্র রাজতন্ত্রী গোষ্ঠীর নেতা। স্বৈর রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। এই সন্ত্রাস "শ্বেত সন্ত্রাস" নামে খ্যাত। অষ্টাদশ লুই চরমপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন। এই পরিস্থিতিতে ১৮২৪ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে ইংল্যাণ্ডে যে গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, তার ফলে ১৮৩২ খ্রীঃ ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করে ইংল্যাণ্ডে প্রথম সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়।

বস্তুত জুলাই বিপ্লবের প্রভাব শুধু ফ্রান্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সর্বত্র সফল না হলেও প্রায় সমগ্র ইউরোপেই জুলাই বিপ্লবের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। এই বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ১৮৪৮ এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সাফল্যের সহায়ক হয়েছিল। লুই ফিলিপের রাজতন্ত্রের ভিত্তি ছিল বুর্জোয়া শ্রেণী। শ্রেণী স্বার্থেই রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহৃত হত বলে প্রথম থেকেই বিভিন্ন দল ও শ্রেণী লুই ফিলিপের বিরোধিতা করছিল। রাজতন্ত্রীরা চেয়েছিল ফ্রান্সে বুরবোঁ বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। যাজকেরাও জুলাই রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল। কারণ জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে তাদের প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। প্রজাতন্ত্রীরাও ক্ষুব্ধ ছিল। জুলাই বিপ্লবে প্রজাতন্ত্রদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও ক্ষমতা চলে যায় বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ করা হয় অন্তত দুশো ফ্রাঁ করদাতাদের মধ্যে। তাই শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণী ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়, অনেক প্রজাতন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাই প্রজাতন্ত্রীরা জুলাই বিপ্লবের ফলাফলে খুশি হয়নি। শিল্পায়নের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হওয়ায় গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক দল। প্রূধোঁ, লুই ব্লাঁ প্রমুখের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রীরা ও জুলাই রাজতন্ত্রের অবসান চেয়েছিল। মধ্যপন্থী বোনাপার্টিস্ট দলের কাছে ও লুই ফিলিপের রাজত্বকাল ছিল হতাশাজনক ও অগৌরবের, বস্তুত কোন ও শ্রেণীর অকুণ্ঠ সমর্থন লুই ফিলিপ লাভ করেননি।

রাজত্বের প্রথম দিকে কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করলে ও ক্রমশ ফিলিপের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। তাঁর নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ নীতি, বৈচিত্র্যহীন বিদেশ নীতি ফরাসীদের হতাশ করেছিল। মন্ত্রী গিজোর প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গণঅসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। তিয়ের এর নেতৃত্বে জনগণ ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবি করলে ও তা প্রত্যাখ্যাত। এর প্রতিবাদে ১৮৪৮ এর ২২ শে ফেব্রুয়ারি প্যারিসে এক জনসভা আহুত হয়। সরকার জনসভা নিষিদ্ধ করলেও দলে দলে ছাত্র শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ জনসভায় যোগ দিতে সমবেত হয়।

গ) জার্মানির ঐক্য আন্দোলনে বিসমার্কের ভূমিকা কী ছিল ?

উঃ– উদার জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিসমার্ক তার রক্ত ও লৌহ নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেন। জার্মান জাতীয় সভা তার সমরসজ্জার জন্য অতিরিক্ত অর্থবরাদ্দে আপত্তি জানানোয় তিনি শুধু উচ্চকক্ষের সম্মতি নিয়ে করস্থাপন করেন। সমর সচিব ভনরুন ও সেনাপতি মল্টকের সাহায্যে কিছুদিনের মধ্যেই প্রাশিয়ার বাহিনীকে ইউরোপের অন্যতম সেরা সমরবাহিনীতে পরিণত করে। পোল-বিদ্রোহ দমনে রাশিয়াকে সাহায্য করে তিনি রুশ জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের কৃতজ্ঞ ভাজন হন। ইংল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ফ্রান্স ও ততদিনে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের অব্যবস্থিত চিত্ততার জন্য ইউকোরী রাজনীতিতে বিচ্ছিন্ন ফলে বিসমার্কের পক্ষে যুদ্ধ পরিস্থিতি ছিল অনুকূল। এই অবস্থায় ১৯৬২ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনটি যুদ্ধের সাহায্যে বিসমার্ক জার্মানির ঐক্য সম্পূর্ণ করেন।

বিসমার্কের প্রথম যুদ্ধটি ছিল ডেনমার্কের সঙ্গে। ১৮৬৩ সালে ডেনমার্ক শাসন সংস্কারের নামে জার্মান অধ্যুষিত

AMBITION
2015 (Final)

শ্লেজভিগ ও হলস্টাইন রাজ্যদুটি সম্পূর্ণ গ্রাস করতে চাইলে বিসমার্ক আপত্তি জানান এবং এ ব্যাপারে তিনি অস্ট্রিয়ার সমর্থন ও আদায় করে নেন। বিসমার্কের আপত্তিকে ডেনমার্ক অগ্রাহ্য করলে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া একযোগে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ডেনমার্ক যুদ্ধে হেরে যায় এবং ১৮৬৪ তে ভিয়েনায় একসন্ধি যুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ডেনরাজ নবম খ্রীষ্টিয়ান শ্লেজভিগ হলস্টাইনের ওপর সব অধিকার ছেড়ে দেন। ১৮৬৫র গেস্টিনের চুক্তিতে শ্লেজভিগে প্রাশিয়ার এবং হলস্টাইনে অস্ট্রির আধিপত্য স্বীকৃত হয়।

এরপরই বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। অস্ট্রিয়ার হাত থেকে ভেনিসিয়া যাতে ইতালির হাতে যায়, সেই ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে তিনি ইতালিকে দলে টেনে নেন। ১৮৬৬ সালে শ্লেজভিগ-হলস্টাইন প্রশ্নটি অস্ট্রিয়া জার্মান কনফেডারেশনের সভায় উত্থাপন করেন। গেস্টিনের চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছে, এই অজুহাতে বিসমার্ক হলস্টাইন আক্রমণ করে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন। সাত সপ্তাহের যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়া সাদোয়ার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। প্রাগের সন্ধি অনুসারে পুরনো জার্মান কনফেডারেশনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান রাষ্ট্রজোট স্থাপিত হয়। ভিয়েনা-কেন্দ্রিক ইউরোপের রাজনীতি হয়ে ওঠে বার্লিনকেন্দ্রিক।

AMBITION

প্রাশিয়ার এই উত্থানে ফ্রান্সের কূটনৈতিক পরাজয় ঘটে। স্বভাবতই উত্তেজিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান। ঠিক এই সময়ে স্পেনের সিংহাসনে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিরোধ দেখা যায়। ১৮৬৯ সালে প্রজাবিদ্রোহের মুখে স্পেনের রাণী ইসাবেলা দেশ ত্যাগ করলে স্পেন এর অভিজাত গোষ্ঠী দক্ষিণ পশ্চিম জার্মানির এক ক্ষুদ্র রাজ্যের যুবরাজ লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে বসার আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু প্রাশিয়া ও স্পেন একই হোহেনজোর্লান বংশের হাতে চলে যাবে, এটা মেনে নিতে রাজি হননি ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান। তিনি কাউন্ট বেনেদিতিকে দূত হিসেবে এমস নামক এক স্বাস্থ্য নিবাসে প্রাশিয়া রাজ প্রথম উইলিয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন ফ্রান্সের আপত্তি জানাবার জন্য। প্রথম উইলিয়াম সে আপত্তি অগ্রাহ্য করে এবং খবরটি টেলিগ্রাম করে বিসমার্ককে জানান। চতুর বিসমার্ক "এমস টেলিগ্রামের" অংশ বিশেষ বিকৃত বিবরণসহ এমনভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, যাতে মনে হয় ফরাসি দূর জার্মানির হাতে অত্যন্ত অপমানিত হয়েছেন। ফরাসি জনমত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং সম্রাট প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হন। ১৮৭০ এর সেপ্টেম্বরে সেডানের যুদ্ধে ফরাসিবাহিনী প্রাশিয়ার হাতে বিধ্বস্ত হয়। ১৮৭১ এর মে মাসে সম্পাদিত ফ্রাঙ্কফুর্ট চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স আলসাস লোরেন, মেৎস, দূর্গ, স্ট্রাসবুর্গ প্রাশিয়ার হাতে তুলে দেয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেব পাঁচশ কোটি ফ্রাঁ প্রাশিয়াকে দিতে রাজি হয়। দক্ষিণ জার্মানির রাজ্যগুলো অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রোটেস্ট্যান্ট প্রাশিয়ার নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবেই জার্মান ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাশিয়ার রাজা ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সম্রাট হিসাবে স্বীকৃত হন। বিসমার্ক হন নতুন জার্মানির চ্যান্সেলর।

ঘ) বার্লিনচুক্তি (১৮৭৮) কি বলকান দাবিগুলির আশা আকাঙ্খাপূর্ণ করতে পেরেছিল ?

উঃ ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্য রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, গ্রীস ইত্যাদি অঞ্চল সমূহ নিয়ে গঠিত ছিল। এই সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তুরস্কের এই দ্রুত অধঃপতনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে স্বার্থ সংস্কৃতি দেখা দেয় এবং তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই ইউরোপের ইতিহাসে পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এককথায় ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে তুর্কীদের অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে যে জটিল রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাকেই ইউরোপের ইতিহাসে পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যা বলা হয়েছে।

পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যা ইউরোপ তথা বিশ্ব ইতিহাসের এক জটিলতম সমস্যা। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতকে দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল –

(১) তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা এবং (২) তুরস্কের ভবিষ্যত নিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত উনিশ শতকের সঙ্গে যুক্ত হয়, তৃতীয় উপাদান – বল্কান অঞ্চলের খ্রিষ্টান জাতিগুলির জাতিয়তাবাদী আশা আকাঙ্খা। তারা তুরস্কের অধীনে নানা অত্যাচার ভোগ করত। তাই তুর্কী শাসন শৃঙ্খলা ভেঙে ফেলার জন্য তারা তৎপর হয়ে ওঠে। এইভাবে পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়।

রুশ তুরস্ক যুদ্ধ ও অন্যান্য রাষ্ট্রবর্গের হস্তক্ষেপঃ

বল্কান অঞ্চল ও কৃষ্ণ সাগরের ওপর রুশ প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে রুশ তুরস্ক যুদ্ধ শুরু হলে ইউরোপে শক্তিসাম্য বজায় উৎকণ্ঠিত বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠী প্যারিসের সন্ধি (১৯৫৬) দ্বারা রাশিয়ার এই প্রয়াসকে প্রতিহত করেছিল। কিন্তু ১৮৭৭ খ্রীঃ রাশিয়া তুরস্ককে পরাজিত করে স্যানস্টিফেনের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে অতীতের ক্ষতিপূরণ করে নেয়। ইংল্যান্ড ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই রুশ অগ্রগতির বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

2015 (Final)

বার্লিন কংগ্রেস ঃ স্যানস্টিফানোর সন্ধির ফলে রাশিয়ার অভাবনীয় প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া সঙ্কিত হয়ে এই সন্ধির পুনর্বিবেচনার দাবী করল। রাশিয়া ... না দেখে সে দাবী মেনে নিল। ফলে জার্মানীর চ্যান্সেলার বিসমার্কের সভাপতিত্বে বার্লিনে ইউরোপীয় রাষ্ট্র গুলির এর বৈঠক হয়। এই বৈঠকে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় যা বার্লিন সন্ধি নামে পরিচিত।

সন্ধির শর্তগুলি হল নিম্নরূপ ঃ–

(১) বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হবে –

(ক) প্রকৃত বুলগেরিয়া স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করল।

(খ) পূর্ব রুমানিয়াকে স্বায়ত্ব শাসন দিয়ে সুলতানের অভিভাবকত্বে স্থাপন করা হয়।

(গ) ম্যাসিডোনিয়াকে তুর্কী শাসনাধীন রাখা হয়।

(২) সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, রুমানিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হল যা ইতিমধ্যে স্যানস্টিফানোর সন্ধিতেও স্বীকৃত হয়েছিল।

(৩) রুমানিয়া রাশিয়াকে বেকার ভিয়া সহ ডানিয়ুব নদীর সন্ধিহিত অঞ্চল ছেড়ে দিলে বিনিময়ে ... লাভ করল।

(৪) বার্লিন সন্ধির সম্পূর্ণ নতুন শর্তানুসারে বসনিয়া ও হার্জিগোভিনার শাসনভার অস্ট্রিয়ার ওপর ন্যাস্ত হয় এবং ইংল্যান্ড সাইপ্রাসদ্বীপ লাভ করে।

সমালোচনা ঃ বার্লিন সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার সমাধান তো হয়নি, বরং জটিলতা বাড়িয়ে তোলে। এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা পরবর্তীকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিস্ফোরণে সাহায্য করেছিল।

রুশ তুরস্ক যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে ইউরোপের অবস্থা ঃ

শান্তি স্থাপন করে এবং রাশিয়ার আগ্রাসী নীতি প্রতিহত হয়। তাই ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বার্লিন বৈঠক থেকে ফিরেই সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন 'আমি সম্মানের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে ফিরে এসেছি' এবং ইউরোপের তুরস্ক তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এই উক্তির অসারতা ধরা পড়ে।

প্রথমত ঃ – স্যানস্টিফানো সন্ধির সূত্রে রাশিয়া যে সুযোগসুবিধা লাভ করেছিল তার অধিকাংশই তাকে ছাড়তে হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ – এই চুক্তির ফলে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সম্পর্কের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত ঃ – তুরস্ক সাম্রাজ্যের যথার্থ অখন্ডত্ব রক্ষিত হয়নি। তুরস্কের অর্ধেকেরও বেশি অংশ পায়। তুরস্ক স্বয়ং শাসিত রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

চতুর্থত ঃ – ইংল্যান্ডের সঙ্গে তুরস্কের যে সম্পর্ক আস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল তা নষ্ট হয়ে যায়।

পঞ্চমত ঃ – বার্লিন চুক্তির দ্বারা জাতিয়তাবাদী বল্কান সমস্যার কোন সমাধান হল না। কারণ সার্বিয়া, রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়া তাদের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চল হারিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

মূল্যায়ন ঃ– প্রকৃতিপক্ষে বার্লিন সন্ধি ইউরোপের কাছে শান্তির জন্য একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। ঐতিহাসিক টেলর বলেছেন যে, এই সন্ধির ফলেই ইউরোপের অন্ততঃ চারটি নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয় – রুশ–অস্ট্রিয়া, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া – অস্ট্রিয়া এবং সার্বিয়া – বুলগেরিয়া। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনও এই সন্ধির মূল্যায়নে বলেছেন যে বার্লিন কংগ্রেস এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল হল প্রত্যেক শক্তি অসন্তোষের শিকার হয়েছিল।

৩। যে কোনো চারটির সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ

ক) সন্ত্রাসের রাজত্ব বলতে কি বোঝ ?

উঃ ফরাসি বিপ্লবকালে ফরাসি আইন সভা জিরন্তিন দলের পতনের (১৯৭৩ খ্রিঃ) পাশাপাশি জ্যাকোবিন দলের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় একদিকে বহিঃশত্রুর আক্রমনে এবং অপর দিকে রাজতন্ত্রের সমর্থকদের বিরোধীতার ফলে ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। এ সময়ে জাতীয় কনভেনশনের উগ্রপন্থী জ্যাকোবিন দলের নেতারা উপলব্ধি করলেন যে, প্রজাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সর্বাগ্রে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন এবং ভীতি প্রদর্শন দ্বারাই তা সম্ভব। এই ধারণায় বসবর্তী হয়ে তারা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম (২রা জুন ১৭১৩ – ২৭শে জুলাই ১৭১৪ খ্রিঃ) করে।

সন্ত্রাস শাসনের সংগঠন ঃ জাতীয় কনভেনশন জননিরাপত্তা কমিটি ও সাধারন নিরাপত্তা সমিতি গঠন করে। সর্বত্র শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিক কায়েম করার দায়িত্ব ছিল সাধারন নিরাপত্তা সমিতির ওপর।

(১) **বিপ্লবী বিচারালয় ঃ** সাধারণতন্ত্রী এবং বিশেষ করে জ্যাকোবিনের আদর্শে বিরোধী ব্যক্তিরা দেশদ্রোহী বলে সাবস্ত্য হয় এবং তাদের বিচারের জন্য বিপ্লবী বিচারলয়ে প্রেরণ করা হয়।

(২) **সন্দেহের আইন ঃ** এই আইন অনুসারে যে কোন ব্যক্তিকে সাধারণতন্ত্র বিরোধী বলে সন্দেহ হলে গ্রেপ্তার করা বৈধ বলে ঘোষণা করা হত। এদের অপরাধ প্রমানের অপেক্ষা না করেই মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হত।

সন্ত্রাসের প্রকৃতি ঃ একমাত্র প্যারিসের ট্রাইবুন্যালের বিচারেই হাজারের বেশি মানুষের জীবননাশ হয়। প্রাণদন্ডে দন্ডিত

AMBITION
2015 (Final)

ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফরাসি নারী মেরি অ্যানন্টিতনেট। জননিরাপত্তা সমিতি ও বিপ্লবী বিচারালয়ের নৃশংস ও ভয়াবহ কার্যাবলী ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। সন্ত্রাসের শাসনে মোট ৪০,০০০ ব্যক্তির জীবন নাশ ঘটে।

কার্যাবলী ঃ রোবনপিয়ারের নেতৃত্বে জাতীয় কনভেনশান কতকগুলো সংস্কারমূলক কার্যে মনোনিবেশ করে। (১) চার্চগুলো বন্ধ করে ও খ্রিষ্টধর্মের অনুষ্ঠান সীমিত করে 'যুক্তির পূজা প্রবর্তিত হয়।'

(২) প্রচলিত খ্রিস্টান বর্ষপঞ্জির পরিবর্তে নতুন প্রজাতান্ত্রিক বর্ষপঞ্জি গৃহিত হল।

(৩) শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি নতুন আইন সংহিতা (Low Code) রচনার কাজ শুরু হয়।

গ) শিল্প বিপ্লবের সংজ্ঞা।

উঃ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপ দ্বৈত বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল যথা, ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ও ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হেইজ এর মতে, শিল্প বিপ্লব কথাটির অর্থ হল মানুষের দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে কলকারখানা ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন। ১৮৩৭ খ্রিঃ ফরাসি সমাজতন্ত্রবিদ ব্ল্যাংকি প্রথম শিল্প বিপ্লব কথাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচলন করেন। ঐতিহাসিক হবসন মনে করেন শিল্প বিপ্লব যে রকম আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিল তাকে শিল্প বিপ্লব বলা না চলে তাহলে 'বিপ্লব' শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে সংশোধনবাদী বক্তব্য ঃ –

অধ্যাপিকা ফিলিস ভিন তাঁর 'The First Industrial Revolution' গ্রন্থে দেখিয়েছেন কেবলমাত্র যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই শিল্প বিপ্লব হয় না। শিল্প বিপ্লবের আনুষাঙ্গিক পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন যেমন –

(১) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য উৎপাদন এবং আধুনিক বিভাজনের ব্যাপক প্রয়োগ। (২) গ্রামীন মানুষের শহরের দিকে অভিপ্রয়াস এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ।

(৩) পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। এই সমস্ত পরিবর্তনগুলো যদি একত্রে আশানুরূপ বিকাশ ঘটে তাহলে শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন হয়।

বৈশিষ্ট্য ঃ – শিল্পবিপ্লবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এগুলো হল –

(১) শিল্পবিপ্লব আকস্মিক হয়নি বরং তা ধীর গতিতে বহু মানুষের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে সংঘটিত হয়েছে সমাজ, অর্থনীতি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছে।

(২) শিল্প বিপ্লব প্রাথমিক পর্যায়ে ইংল্যান্ডে সূচিত হয়েছিল এবং পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সম্পাদিত হয়েছে।

(৩) শিল্প বিপ্লবের আগে হয়েছিল প্রারম্ভিক শিল্পায়ন এভং কুটির শিল্পের মাধ্যমে দৈহিক শ্রমের দ্বারা শিল্প সামগ্রির উৎপাদন।

(৪) শিল্প বিপ্লবের ফলে গড়ে ওঠে শহরকেন্দ্রিক শিল্প সভ্যতা। পাশাপাশি শিল্প মালিক ও শ্রমিক শ্রেণী নামক দুই পরস্পর বিরোধী সামাজিক শ্রেণীর উল্লেখ ঘটে।

ঙ) ডিসেম্ব্রিস্ট আন্দোলন (১৮২৫)

উঃ– ফরাসী ইতিহাসে ডিসেম্ব্রিস্ট আন্দোলন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বাধীনতা লাভের জন্য গড়ে ওঠে "হেতাইরিয়া ফিলিক" নামক গুপ্ত সমিতি। ১৮২১ খ্রীঃ এই সমিতির সভাপতি আলেকজান্ডার ইপসিলান্তির নেতৃত্বে রুমানিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মেটারনিকের প্রভাবে রুশ জার গ্রিকদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। ইপসিলান্তির অভ্যুত্থান তুরস্ক দমন করে। কিন্তু নির্মম অত্যাচার সত্ত্বেও মোরিয়ার বিদ্রোহ তুরস্ক দমন করতে পারেনি। মোরিয়ার বিদ্রোহ অন্যান্য গ্রিক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ গ্রিসের স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়।

চ) লেলিন।

উঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে সংঘটিত হয়েছিল বলশেভিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রধান নেতা ছিলেন লেনিন। লেনিন বলশেভিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বলশেভিকদের সাফল্যের পশ্চাতে একাধিক কারণ ছিল –

(ক) যুদ্ধকালীন অবস্থায় সৈন্য বাহিনী ও শহরের শ্রমজীবি মানুষের মনে অবসাদ ও হতাশাবোধ সৃষ্টি হয় তারা বলশেভিকদের প্রতি সমর্থন জানায়।

(খ) বলশেভিক দলের সুনিপুন সংগঠন বলশেভিক দলকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

এছাড়া লেনিন রাশিয়ার অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য ১৯২১ খ্রীঃ যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তা 'New Economic Policy' বা N.E.P. বলাহয়। এই নতুন পরিকল্পনা অনুসারে গোঁড়া সাম্যবাদী অর্থনীতিকে উদার করা হয়। কৃষকের খোলাবাজের উল্লেখ সদস্যের উদ্বৃত্ত বিক্রয়ের অনুমতি পেল। রাশিয়ার দূত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বৈদেশিক

AMBITION
2015 (Final)

খনন গ্রহণের নীতিও গৃহীত হয়। এইভাবে নূতন আর্থিক নীতির ফলে রাশিয়ার অভ্যেন্তরীন নীতিতে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল।

পরিশেষে বলা যায় লেনিন ১৯১৭ খ্রীঃ ১৬ই এপ্রিল বলশেভিক কর্মীদের সামনে 'এপ্রিল থিসিস' ঘোষণা করেন। (১) মার্চ বিপ্লবে সৌভিয়েত গুলোর প্রধান ভূমিকা ছিল, তাইতিনিমর ক্ষমতা সোভিয়েত গুলোর হাতে প্রদানের দাবি করেন (২) রুশ জনগণের বহুদিনের দাবি – 'শান্তি, খাদ্য ও জমি পূরণ করা হবে।' এভাবে লেলিনের এপ্রিল থিসিস মার্চ বিপ্লবকে নভেম্বর বিপ্লবে উন্নীত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

AMBITION

2015 (Final)